বেঙ্গল টাইমস

অশ্বডিম্ব প্রসব করবে এস আই আর!

১ ডিসেম্বর, ২০২৫

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in

সম্পাদকীয়

কল্লোলিনীর মুকুটে

পুজোর রেশ আগেই কেটে গেছে। এখন যাই যাই হেমন্ত। যত দিন যায়, ঋতুগুলো কেমন যেন আবছা হতে থাকে। নিন্দুকেরা বলেন, এখন বারো মাসের মধ্যে এগারো মাস গরম কাল। বাকি এক মাসের মধ্যে কুড়িয়ে বাড়িয়ে বাকি পাঁচটা ঋতু কুলিয়ে যাবে। অর্থাৎ, কয়েকদিন বর্ষাকাল, কয়েকদিন শীতকাল। শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত বলে বাস্তবে কিছু নেই। কল্পনা বিলাসী মন হালকা শীতের মাঝে হেমন্তকে বা যাই যাই শীতে বসন্তকে খুঁজে নিতে পারে।

একসময় রচনা আসত হেমন্তকাল, বসন্তকাল। বহু বছর পরীক্ষায় বোধ হয় সেই রচনা আসেনি। রচনার বইয়েও কি রচনাগুলো আছে? জানা নেই। মাঝ নভেম্বর যেন একটু একটু করে শীতকে স্বাগত জানানোর মরশুম। এরই মাঝে কলকাতার মাথায় আরও একটা পালক। বিশ্বের অন্যতম সেরা পর্যটন শহরগুলির মধ্যে জায়গা পেয়েছে আমাদের কলকাতা। কারা দিল, তার ভিত্তি কী,

তা নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে নানা যুক্তি থাকতেই পারে। বা এতে সরকারের সাফল্য কোথায়, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতেই পারে। আপাতত সেসব সরিয়েই রাখা যাক। কলকাতা, বাংলা কোথাও স্বীকৃতি পেলে ভালই লাগে। নিন্দুক সত্তা না হয় আপাতত সিন্দুকে তোলা থাক।

কলকাতার ঐতিহ্য, পরম্পরা এসব নিয়ে বিশেষ সংখ্যা হতেই পারত। পরে করাই যায়। আপাতত এই সংখ্যা পাঁচমিশেলি। আগামী কয়েক মাস একসঙ্গে অনেকেরই জন্ম শতবর্ষ। সেই দিকপাল মানুষদের নিয়েও বিশেষ সংখ্যা করার ইচ্ছে আছে। আর শীতে পর্যটন তো আছেই।

শূন্য মোটেও শূন্য নয়

প্রশান্ত বসু

হয় দশের নীচে, নইলে দেড়শোর বেশি। ভোটের আগে বারবার এই কথাটাই বলে আসছিলেন প্রশান্ত কিশোর। দেখা গেল, একেবারে সঠিক অনুমানই করেছিলেন। তাঁর দলের আসন দশের নীচে তো বটেই, এমনকী শূন্যর গন্ডিও অতিক্রম করতে পারেনি।

মনে করা হয়েছিল, জনসুরাজ পার্টি যদি বেশি আসন নাও পায়, অধিকাংশ আসনেই বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারে। দুই শিবিরেরই ভোট কেটে অদ্ভুত একটা সমীকরণ তৈরি করে ফেলতে পারে জনসুরাজ। দেখা গেল, সেটাও হল না। তাঁর দলের ভোট সাড়ে তিন শতাংশেরও কম। কাউকেই তেমন বিপাকে ফেলতে পারেননি।

এমনকী কয়েকমাস আগে হওয়া উপনির্বাচনে যাও বা দশ শতাংশের মতো ভোট এসেছিল, এবার সেটাও আসেনি। হঠাৎ কী এমন হল যে, পিকে–র যাবতয়ী হাওয়া এভাবে উবে গেল?

নিজের ক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেলেও নীতীশ কুমারের দল সম্পর্কে যে

ভবিষ্যবাণী করেছেন, তা একেবারেই মেলেনি। বলেছিলেন, নীতীশ কুমারের দল ২৫ এর বেশি আসন পাবে না। অথচ, তার তিন গুনেরও বেশই আসন নিয়ে দশমবার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পথ নীতীশ কুমার।

কিন্তু তার পরেও বলতে হবে, তিনি বড় একটা ফ্যাক্টর। শুরু থেকে শেষ, প্রচারকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। ধর্মের সুড়সুড়ি দিতে দেখা যায়নি। জাতিভেদ উস্কে দেওয়ার কোনও চেষ্টাই করেনি। বাকি দল যখন হিন্দু-মুসলিম আর উঁচু জাত-নীচু জাতের বিভাজনে মগ্ন, তখন তিনি লাগাতার শুনিয়ে গেছেন কর্মসংস্থানের কথা। বারবার দেখিয়েছেন নতুন দিশা। মনে হয়েছে, রাজ্য প্রশাসন চালাতে গেলে এই মাপের লেখাপড়া ও পরিণতি বোধ থাকা দরকার। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা, কথাবার্তার কাছে বাকিদের বড়ই ম্লান মনে হয়েছে।

কোথায় গলদ, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। কোন পথে রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব তার একটা স্পষ্ট রূপরেখাও যেন তৈরি। যেগুলো বলছেন, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়, ভরসা হয়। অন্তত আর কোনও নেতা এই পর্যায়ের স্বপ্ন দেখাতে পারেননি। শুধু বিহার নয়, গোটা দেশে এমনটা দেখা যায়নি।

যা যা বলেছেন, কথা রেখেছেন। বলেছিলেন, সবথেকে বেশি শিক্ষিত মানুষ তাঁর দলের প্রার্থী তালিকায় থাকবেন। অন্য দলে যখন মাফিয়ার দাপাদাপি, তখন তাঁর দলে শিক্ষিত, মার্জিত, জীবনবোধে পরিপূর্ণ মানুষের সমাগম। বলেইছিলেন, অন্য দল থেকে টিকিট না পাওয়া নেতাদের দলে নেবেন না। এই কথাটাও রেখেছেন। অথচ, তাঁর প্রার্থীদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করাতে ক্ষমতার অপব্যবহার করে গেছেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এমন প্রবল প্রতাপশালী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বড়ই ভীরু ও কাপুরুষ মনে হয়েছে তাঁর কাছে।

এরপরেও তাঁর আসন শূন্য। যথারীতি গোদি মিডিয়া লাফিয়ে পড়েছে। বিরাট উল্লাস। প্রশান্ত কিশোর কি রাজনীতি ছাড়ছেন?

না, এত সহজে সরে যাওয়ার বান্দা তিনি নন। অন্তত আরও পাঁচটা বছর তিনি লড়াই চালিয়ে যাবেন। ডাক শুনে কেউ না এলে তিনি একলাই চলবেন। কে বলতে পারে, পাঁচ বছর পর বিহারে অন্য এক ইতিহাস লেখা হবে না!

জল ঘোলা করাতেই যত আনন্দ

স্বরূপ গোস্বামী

সহজ কাজকে অকারণে জটিল করতে নির্বাচন কমিশনের জুড়ি নেই। অবশ্য নির্বাচন কমিশনকে একা দোষ দিয়ে লাভ নেই। কেন্দ্রে যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা সবসময়ই একটা যুদ্ধ-যুদ্ধ ভাব বজায় রাখতে চান। ব্যস, গোটা দেশ ওই নিয়ে মেতে থাক। যে যার মতো করে ঘৃণা ছড়িয়ে যাক। তাতে অনেক কিছু চাপা পড়ে যাবে।

গত কয়েক মাস ধরে একটাই আলোচনা, এসআইআর। নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন। বেশ ভাল কথা। ভোটার তালিকা সংশোধন হওয়াই উচিত, এ নিয়ে কোনও সংশয় বা দ্বিধা থাকার কথা নয়। কিন্তু তার জন্য গোটা দেশে এমন আতঙ্কের আবহ তৈরি করতে হবে কেন? কী কেন্দ্র, কী রাজ্য, দু'পক্ষই যেন ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছেন। জলঘোলা না করলে তাঁদের তৃপ্তিই হয় না।

ভোটার তালিকা সংশোধনের একটা বড় অংশ হল মৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া। যত নাম বাদ পড়বে, তার অন্তত সত্তর শতাংশ মৃত ভোটার। এই কাজটা করতে

এত হই হট্টগোল করা কি সত্যিই জরুরি? একটু সদিচ্ছা থাকলে সাতদিনেই করে ফেলা যায়। এর জন্য কোনও আতঙ্ক ছড়ানোর দরকার নেই। এমনকী আমজনতা বুঝতেও পারবে না।

সত্তর ভাগ কাজ মসৃণভাবে হয়ে গেলে, বাকি তিরিশ ভাগ কাজ সময় নিয়ে, ধীরে সুস্থে করা যেত। যাঁরা কমিশনের মাথায় বসে আছেন, তাঁদের বুদ্ধি নেই, এমন তো হতে পারে না। তাঁরা অনেক বেশি বিচক্ষণ। কিন্তু তারপরেও সহজ কাজটা যখন জটিল করেন, তখন প্রশ্ন জাগে।

ধরা যাক, ২০২৪ সালে কারা মারা গিয়েছেন, এই তালিকা করতে চান। একটু ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখুন, কত সহজে এটা করা যায়। জেলাশাসকদের শুধু বলা হোক, সাতদিনের মধ্যে আপনার জেলার তালিকা দিন। তিনি কী করবেন? সিএমওএইচ-কে ডেকে নির্দেশ দেবেন, জেলা হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতাল, ব্লক হাসপাতাল মিলিয়ে এক বছরে যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, সেই তালিকা দিন। যে কোনও হাসপাতালের কাছেই এই তালিকা দেওয়া কোনও ব্যাপারই নয়। একদিনেই দেওয়া যায়। হয়তো এক ঘণ্টাতেও দেওয়া যায়। এরপর নার্সিংহোম। জেলার নার্সিংহোম গুলোর কাছেও নার্সিংহোমে মৃতদের তালিকা চাওয়া যায়। তাঁদেরও এই তালিকা দিতে একদিনের বেশি লাগার কথা নয়। শুধু হাসপাতাল ও নার্সিংহোম ধরলেই ষাট থেকে সত্তর শতাংশ নাম পাওয়া গেল।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, অনেকে তো বাড়িতেও মারা যান। ঠিক কথা। কিন্তু বাড়িতে মারা

গেলেও কদিন পরে তাঁকে ডেথ সার্টিফিকেট নিতে হয়। কারা দেয়? পঞ্চায়েত বা পুরসভা। কার কার সার্টিফিকেট ইস্যু হল, তাদের কাছে লিস্ট থাকার কথা। এক ঘণ্টার নোটিশেই সেটা পাওয়া সম্ভব। জেলাশাসকের নেতৃত্বে একটা আলাদা সেল খোলা হলে তারা এক–দুদিনের মধ্যেই তালিকা তৈরি করে দিতে পারে।

যে পদ্ধতিতে ২০২৪ হল, সেই পদ্ধতিতেই ২০২৩, ২২, ২১ এর তালিকা তৈরি করা সম্ভব। মনে করুন কোভিডের কথা। তখন প্রতিদিন বিকেলে সরকার জানিয়ে দিত, সারা রাজ্যে কতজন ভর্তি হয়েছে, কতজনের টেস্ট হয়েছে, কতজন পজিটিভ, কতজনের মৃত্যু হয়েছে। অর্থাৎ সরকার বিকেলের মধ্যে প্রতিদিনের আপডেট জানিয়ে দিত। অর্থাৎ, সরকার চাইলে এই কাজটা নিঃশব্দেই করা যায়। এত ঢাক পেটানোর দরকারই পড়ে না। এত বিএলও, এত বিএলএ কিছুই দরকার পড়ে না।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, যদি কোনও পুরসভা তালিকা না দিতে পারে বা ভুল তালিকা দেয়! তারও ব্যবস্থা আছে। যারা ডেথ সার্টিফিকেট তুলেছেন, তাঁরা ব্যাঙ্ক বা বিএলআর অফিসে জমা করেছেন। সেখান থেকেও আলাদা তালিকা চাওয়াই যায়। তারপর শুধু মিলিয়ে দেখা। ব্যাঙ্কের তালিকায় নাম আছে, অথচ পুরসভা বা পঞ্চায়েতের তালিকায় নেই। গরমিল সহজেই ধরা যায়। তবে সেটা পরের ধাপ। আগে যে তালিকা হাসপাতাল, পুরসভা, ব্যাঙ্ক থেকে উঠে এল, তার ভিত্তিতেই নব্বই শতাংশ বাদ চলে গেল। এর পরের ধাপে, যেখানে গরমিল আছে, সেগুলো নিয়ে বসা। এর জন্যও তিন দিনের বেশি লাগার কথা নয়। দু–একজন পুরপ্রধানকে একটা চিঠি পাঠানোই যথেষ্ট। এক দুজনকে কয়েকদিন জামাই আদর করলেই বাকিরাও সব সাবধান হয়ে যাবেন। যেখানে গরমিল থাকবে, এসপিকে বলা হোক, তদন্ত করে তিনদিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে। আর কেউ বেগড়বাই করতে পারবেন না।

সদিচ্ছা থাকলেই করা যায়। একটু বিচক্ষণতা থাকলেই করা যায়। আর এই কাজটা মসৃণভাবে করতে পারলে বাকি কাজগুলো পরের ধাপে আরও মসৃণভাবে করা সম্ভব।

প্রশ্নটা হল সদিচ্ছা আর শিক্ষা নিয়েই। শিক্ষা মানে নিছক ডিগ্রি নয়। প্রশাসন চালাতে গেলে ন্যূনতম কিছু প্রশাসনিক শিক্ষাদীক্ষা লাগে। জালি ডিগ্রি হয়তো জোগাড় করা যায়, কিন্তু তাতে শিক্ষার ঝুলি অপূর্ণই থেকে যায়। কী কেন্দ্র, কী রাজ্য, এই শিক্ষার বড়ই অভাব। মাথাগুলোকে দেখলেই সেটা আরও ভাল করে বোঝা যায়। চেয়ারকে অনেক সম্মান দেখানো হয়েছে। আকাট মূর্খদের এবার আকাট মূর্খ বলার সময় এসেছে।

অশ্বডিম্ব প্রসব করবে এসআইআর

সরল বিশ্বাস

গত কয়েক মাস ধরে একটা কথাই ঘুরেফিরে ভেসে আসছে, এসআইআর। পাড়ায় পাড়ায় বিজেপি সমর্থকদের উল্লাস দেখে মনে হচ্ছে, যেন এসআইআর হলেই বিজেপি ক্ষমতায় চলে আসবে। আর এই এসআইআর নিয়ে গলা চড়াতে গিয়ে তাঁরা যা যা যুক্তি তুলে ধরছেন, তাতে নিজেদের ব্যর্থতাই আরও বেশি করে প্রকট হচ্ছে।

যেমন, আমাদের রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। তিনি মাঝে মাঝেই হুঙ্কার দিয়ে বলছেন, ‘গত দশ বছরে এই বাংলায় এক কোটি অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তাদের এবার তাড়ানো হবে।’ হাততালি পাচ্ছেন ব্যাপক। কারণ, যাঁরা হাততালি দিচ্ছেন, তাঁদের এত বোঝার মতো বুদ্ধিসুদ্ধি নেই।

আচ্ছা, ধরেই নিলাম, দশ বছরে এক কোটি লোক এই বাংলায় ঢুকেছেন। যদি সত্যিই ঢুকে থাকেন, তাহলে কার কান ধরে উঠ–বস করার কথা। দেশের সীমান্ত কারা পাহারা দেয়? সেই দপ্তরের মন্ত্রী কে? মোদি সরকারের প্রথম পাঁচবছরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম ছিল রাজনাথ সিং, পরের পাঁচ বছর অমিত শাহ। বিরোধী দলনেতার দাবি সত্যি হলে, এই দুই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁদের দায়িত্ব পালনে চূড়ান্ত ব্যর্থ। তার মানে, এই দুজনকে কি চরম অপদার্থ বলতে চাইলেন?

ধরেই নিলাম, এঁদের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড পেতে রাজ্য প্রশাসনের অনেকে সাহায্য করেছেন। কিন্তু এঁরা যদি সীমান্ত পেরিয়ে না আসতেন, তাহলে তো তাঁদের ভোটার কার্ড বানিয়ে দেওয়ার সুযোগটাই থাকত না। অনেকে বলে বেড়াচ্ছেন, রাজ্যে অনেক জায়গায় কাঁটাতার দেওয়া নেই, তাই অনুপ্রবেশ হচ্ছে। এটা তাঁরাই বলতে পারেন, সীমান্ত সম্পর্কে যাঁদের তেমন কোনও ধারণা নেই। একবার টাকি থেকে ঘুরে আসুন। একবার যে কোনও সীমান্তবর্তী এলাকায় ঘুরে আসুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন। অসমেও তো বিরাট এলাকা কাঁটাতার নেই। অরুণাচলেও সীমান্ত নেই। আরও অনেক রাজ্য রয়েছে, যেখানে কাঁটাতার নেই। কেন্দ্র আগে সেইসব রাজ্যে কাঁটাতারের ব্যবস্থা করুক। তারপর না হয় বাংলা নিয়ে জ্ঞান দেবে।

হ্যাঁ, সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ যেমন হয়, তেমনই গরুপাচার হয়। আরও অনেককিছুই পাচার হয়। রাজ্য পুলিশের বড় একটা অংশ যেমন এতে যুক্ত থাকে, ঠিক তেমনই কেন্দ্রীয় এজেন্সির কারও কারও সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এই পাচার সম্ভব নয়। সেই পাচারের বখরা যেমন রাজ্যের কোনও কোনও ‘প্রভাবশালী’র কাছে যায়, ঠিক তেমনই কেন্দ্রের কিছু কিছু মাতব্বরের দরবারেও যায়। সেই কারণেই সিবিআই নামক আপাদমস্তক অপদার্থ সংস্থাটি বছরের পর বছর হাত গুটিয়ে

বসে থাকে। অনুপ্রবেশের মূল দায় যেমন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর, ঠিক তেমনই গরু পাচার থেকে শুরু করে রাজ্যের নানা তদন্তে সিবিআই-এর ঘুমিয়ে থাকার দায়ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর।

আসল কথা হল, প্রতিবার ভোটের আগে তাঁদের কিছু না কিছু আতঙ্ক ছড়াতে হয়। কখনও এনআরসি, কখনও সিএএ। আর এরকম ইস্যু পেয়ে গেলে তৃণমূলেরও পোয়াবারো। একজন কেন্দ্র চালায়, একজন রাজ্য চালায়। কারও কোনও জবাব দেওয়ার দায় নেই। একজন হিন্দু হিন্দু করে বেড়ান, অন্যজন সেই সুযোগে মুসলিম তাস খেলেন। ২০১৯ থেকে এনআরসি নিয়ে ভয় দেখানোর কাজ শুরু হয়েছে। আমাদের রাজ্যে কেন্দ্র কতটুকু এগোতে পেরেছে? এত ঘটা করে সিএএ চালু হল। এই বাংলায় কজন আবেদন করেছেন? শান্তনু ঠাকুর বিজেপির সাংসদ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁকে একবার আবেদন করতে বলুন তো। অর্থাৎ, মোদি-অমিত শাহর সিএএ নীতির ওপর তাঁর সরকারের মন্ত্রীরই আস্থা নেই। বেশি জোরাজুরি করলে বাবুল সুপ্রিয়র মতো তিনিও সটান তৃণমূলে চলে আসবেন।

আসলে, দুই সরকারকেই মৌলিক প্রশ্ন থেকে পালিয়ে বেড়াতে হবে। তাই কখনও এনআরসি জুজু, আর কখনও এসআইআর জুজু। আর এমন ইস্যু পেয়ে গেলে তৃণমূলের তো মুশকিল আসান। তারা এই নিয়েই বাজার গরম করে যাবে। তখন বেকারত্ব, দুর্নীতি, পাচার, গোষ্ঠীকোন্দল— এসব ইস্যু অনেক তলানিতে চলে যাবে। আসরে নামানো হয়েছে নির্বাচন কমিশনকে। সারা বছর এই সংস্থাটি কোথায় যে থাকে, কী যে তার কাজ, বোঝাই মুশকিল। ভোট এলেই হঠাৎ করে উদয় হয়, ফাঁপা আওয়াজ দেওয়া শুরু হয়ে যায়।

আচ্ছা, মৃত ভোটারদের নাম হয়তো বাদ যাবে। এতে এত হম্বিতম্বির কী আছে? এতদিন সেই নাম বাদ যায়নি কেন? এটা তো রুটিন পদ্ধতি। তার পরেও বছরের পর বছর সেইসব মৃত ভোটারের নাম থেকে গেছে, কারণ নির্বাচন কমিশন তার রুটিন কাজটুকুও করেনি। যে কেউ মারা গেলে পঞ্চায়েত বা পুরসভা থেকে ডেথ সার্টিফিকেট নিতে হয়। অর্থাৎ, তাদের কাছে তালিকা থাকার কথা। সেই তালিকা প্রতিমাসে তারা জেলা প্রশাসনকে পাঠাবে। জেলা প্রশাসন সরাসরি নির্বাচন কমিশনে পাঠিয়ে দেবে। এই আধুনিক প্রযুক্তি আর ডিজিটাল ইন্ডিয়ার যুগে এটা কোনও কঠিন কাজ? কিন্তু নির্বাচন কমিশনের এই ন্যূনতম মেশিনারিটুকুও নেই। তাঁদের হুমকিকে কে পাত্তা দেয়?

এ রাজ্যের তৃণমূল খুব ভাল করেই জানে, ভোট এলে এই নখদন্তহীন কমিশন বড়জোর দু-একজন অফিসারকে ট্রান্সফার করবে। এর বেশি কিছু করার মুরোদ এই কমিশনের নেই। লোকসভার গণনা কেন্দ্র থেকে সকাল আটটার মধ্যে বিরোধীদের সব এজেন্ট, এমনকী প্রার্থীকেও মেরে বের করে দেওয়া হয়। দুর্বৃত্তরা এই সাহস পায়, কারণ তারা জানে, নির্বাচন কমিশন কিচ্ছু করতে পারবে না। বছরের পর বছর, নির্বাচন কমিশন নিজেদের এতটাই হাসির খোরাক করে তুলেছে। সত্যিই, তাদের সিরিয়াসলি নেওয়ার কিছু নেই।

তাই যতই এসআইআর হোক, দিনের শেষে তা পর্বতের মূষিক প্রসবই হবে। ঠিক সিবিআই তদন্তের যে হাল হয়েছে, এসআইআরেও তাই হবে। কিছু মৃত ভোটারের নাম বাদ পড়বে, এতেই বঙ্গ বিজেপি উল্লাস দেখাবে। অবোধের গো বধেই আনন্দ।

পানশালার সেই হারিয়ে যাওয়া সন্ধে

সুপ্রিয় চ্যাটার্জি

মধ্য কলকাতার একটি পুরনো পানশালা। ভিতরে আক্ষরিক অর্থেই তিলধারণের জায়গা নেই। কোনও মতে স্বল্প আলোতেই সন্তর্পণে পানীয়ের গ্লাস, খাবারের প্লেট টেবিলে টেবিলে পৌঁছে দিচ্ছে দক্ষ পরি-বেশনকারীরা। রঙিন পানীয়ে শূন্য গেলাস পলকেই পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। একধারে স্টেজ। সেখানে মাইক্রো-ফোন হাতে কিন্নরকণ্ঠে গাইছেন কোন সুবেশিনী যুবতী বা উচ্ছলকণ্ঠ গায়ক। যোগ্য সঙ্গতে পিছনে সারি দিয়ে বসে থাকা মিউজিশিয়ানেরা। ‘তেরে বিনা জিন্দেগিসে কোই শিকওয়া’, ‘ইয়ে দিল তুম বিন’ , ‘আকাশ প্রদীপ জ্বলে’ থেকে ‘মনে পড়ে রুবি রায়’ , ‘রানার’ থেকে শুরু করে ‘পুরানো সেই দিনের কথা’ , লতা, কিশোর, রফি, আশা, মান্না, হেমন্ত, শ্যামল, আরতি সন্ধ্যা, সবার গান একের পর এক গাওয়া হয়ে চলেছে, এমনকি রবীন্দ্রসঙ্গীতেরও ইতিউতি উপস্থিতি সেখানে।

সব মিলিয়ে মিনি ফাংশন। বাড়তি পাওনা বহু পুরনো অধুনালুপ্ত গান, যা শ্রোতার অভাবে আজকাল ফাংশনে আর খাওয়া হয় না। আর সুরা কয়েক পাত্র পান করার পর সেসব গান শোনার নস্টালজিক রোমান্টিকতা আর

তো কোথাও মাথা খুঁড়লেও মিলবে না।

নৌশাদ, ও পি নায়ার, শচীন কত্তা, সবার গান শুনতে চাইলে গাইবার কুশলীর অভাব নেই। ওয়ক্ত, পাকীজা, দোস্ত, তাজমহল পুরনো বিখ্যাত সব ছবির গানের ডালি।

লাইভ ব্যান্ড। চলতি কথায় সিঙ্গিং বার। বারে সুরাপান করতে গিয়ে সাথে বাড়তি পাওনা সংগীতলহরী। সন্ধ্যা হলেই উপচে পড়া ভিড়। চাকুরী জীবী, ব্যবসায়ী, উকিলবাবু, উঠতি মস্তান, জমির দালাল, কে নেই সেই ভিড়ে। কলকাতায় নৈশ আমোদ প্রমোদের তালিকায় উচ্চ মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই বিনোদন জায়গা করে নিয়েছে বিগত প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে।

মূলতঃ এই বারগুলি ছিল মধ্য কলকাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ডেকার্স লেনের পিঙ্করুম, মেট্রোপলিটন, চাঁদনী, ওয়াটার লু স্ট্রিটের রক্স, চেরিফিক, আর হান থাই, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের মনসুখ, সি আর এভিনিউয়ে ক্যালকাটা কাফে, ডিউক, চাঁদনী চকে ম্যাজেস্টিক, নিউমার্কেট এলাকায় রক্সি, প্যারিস, প্রিন্সেস, রফি আহমেদ কিদোয়াই রোডে গালিব, এসব জায়গায় মূলত বাংলা, হিন্দি গান হত। ইংরেজি গান হত পার্ক স্ট্রিট এলাকায়।

যাচ্ছে দ্রুত। শ্রোতার আসনে নতুন প্রজন্ম, অসামাজিক নানান চরিত্র। তাদের পরিবর্তিত চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পেরে বিদায় নিয়েছে একে একে সুকন্ঠ শিল্পীরা, তাদের জায়গায় এসেছে চটুল নৃত্যপটু কিশোরী ও

বেশ কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত গায়ক গায়িকা একসময় এই বার গুলোতে গান করে গিয়েছেন। উষা আয়ার (তখনও উত্থুপ হননি) পার্ক স্ট্রিটের একটি রেস্তোরাঁয় গেয়ে গিয়েছেন। মহম্মদ আজিজ (মুন্না) গান গাইতেন গালিব বারে।

তবে প্রদীপের নীচের অন্ধকারের কাহিনীও আছে। প্রথা অনুযায়ী, গায়িকার কন্ঠের প্রতি অনুরাগ অনেক ক্ষেত্রেই সুরার সাহচর্যে শ্রোতার মনকে কাঁচপোকার মতো টেনে নিয়ে গিয়েছে মোহের আবেশে, গান শুনে কিছু পারিতোষিক দেওয়ার সীমা ছাড়িয়ে বহু অর্থের অপচয়ের আঁধারে। মোহ যখন কেটেছে, আর ফেরা হয়ে ওঠেনি স্বাচ্ছল্যের দিনে। আগের সোনালী দিনগুলি হারিয়ে

যুবতীরা, মিউজিশিয়ানদের জায়গায় ল্যাপটপে ট্র্যাকে হালফিলের লাউড মিউজিক, সাইকোডেলিক আলো, অর্থের স্রোত উপচে পড়ে পানশালার মেঝেতে।

মধ্য কলকাতার এলাকা ছাড়িয়ে সিঙ্গিং বার (বর্তমানের চলতি নাম ড্যান্সবার) ছড়িয়েছে গোটা কলকাতায়, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলার শহর ও শহরতলিতে। বহু মানুষের জীবিকা যেমন চলে তেমনি প্রশাসনের স্থায়ী মাথাব্যথার কারণ এই হঠাৎ গজিয়ে ওঠা প্রমোদ কাননগুলি। সংখ্যায় বেড়েছে অবশ্যই। সুখে বেড়েছে কি না জানি না। তবে মন বলে, ‘বাঁশি বুঝি সেই সুরে আর বাজবে না…’।

Sundarban Residency
এবার শীতে সুন্দরবন
2N / 3D Special Package
বিশেষ ছাড়
★Godkhali to Godkhali
1800 103 9161
sundarbanresidency.com

শারদ শুভেচ্ছা
Mahfil
Healthy 'n' Tasty Mahfil The Best Tea
WANTED URGENTLY
Area Wise Financially Sound
Distributors and Professionals
9830201142, 8335044913
Brand Owned By : SACKS BEE
14/20, Uday Sankar Sarani, Kolkata - 700 033
AN ISO 22000 : 2018 & CODEX GMP Certified Company
Packed at : Gobindapur, Benepukur, Mahestala, BBT Road, Kolkata-700 141
Email : sacksombee@gmail.com ● website : www.sacksbee.com

ছৌ মুখোশের চড়িদা গ্রামে একটি দিন

ছৌ নাচের কথা কে না জানেন! কোথায় তৈরি হয় সেই ছৌ–মুখোশ? অযোধ্যার লাগোয়া সেই চড়িদা গ্রাম থেকে ঘুরে এসে লিখলেন বুবুন ঘোষাল।

পুরুলিয়া বললেই সবার আগে কোন ছবিটা ভেসে ওঠে। যারা শিক্ষা অনুরাগী, তাঁরা হয়ত বলবেন, রামকৃষ্ণ মিশনের কথা। যাঁরা ঘুরতে ভালবাসেন, তাঁরা হয়ত বলবেন অযোধ্যা পাহাড়ের কথা। হ্যাঁ, এই দুটোর কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে গেছে, এমন কোনও বিষয়? এমন কোনও লোকসংস্কৃতি? আর ক্লু দেওয়ার দরকার নেই। ছৌ নাচের ছবিটা এতক্ষণে নিশ্চয় মনের মধ্যে ভেসে উঠেছে। হ্যাঁ, এই ছৌ নাচের কথা বললে, এককথায় ভেসে ওঠে পুরুলিয়া জেলার নাম।

কিন্তু এই ছৌ মুখোশ কোথায় তৈরি হয়? হঠাৎ করেই সেই গ্রামে যাওয়ার সুযোগটা এসে গেল। আমরা গিয়েছিলাম পর্বতারোহনের প্রশিক্ষণ শিবিরে। এত

কাছে এলাম। আর ছৌ গ্রাম চড়িদায় যাব না? বাঘমুন্ডি থেকে মাত্র আধ ঘণ্টার পথ। কয়েকটা বাইক নিয়ে, স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে নিয়ে আমরাও বেরিয়ে পড়লাম চড়িদার পথে। গ্রামটা যে খুব আহামরি, এমন নয়। দক্ষিণ বঙ্গের আর দশটা গ্রাম যেমন হয়ে থাকে, অনেকটা সেরকমই। ছোট্ট গ্রাম। গোটা তিরিশেক পরিবার। সব পরিবারই কোনও না কোনওভাবে এই ছৌ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এই গ্রামে যে মুখোশ তৈরি হয়, সেটাই পৌঁছে যায় দেশের নানা প্রান্তে, এমনকী বিদেশেও।

গ্রামের মানুষগুলি বেশ সাধাসিধে। মুখোশ বানালেও ওদের মুখে কোনও মুখোশ নেই। একটু কান পাতলেই ওদের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাবেন। বংশ পরম্পরায় চলছে ঠিকই। কিন্তু কতদিন এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন, ওঁরা নিজেরাও সংশয়ে। এক প্রবীণ শিল্পী বলছিলেন, আমাদের তৈরি মুখোশ বিদেশে মোটা দামে বিক্রি হয় শুনেছি। কিন্তু সেই টাকা তো আমাদের ঘরে আসে না। কাদের কাছে যায়, কে জানে!

মূলত কাগজ আর আঠা দিয়েই তৈরি হয় এই মুখোশ। গ্রামের ৪–৫ বছরের শিশু যেমন কাজ করছে, তেমনি ৮০

বছরের বয়ষ্ক মানুষটিও দিব্যি হাত লাগাচ্ছেন। বাড়ির মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। কেউ শুরুর দিকটা এগিয়ে দেয়। কেউ ফিনিশিংয়ে বেশি পারদর্শী। কারও হাতে রঙের কাজ দারুণ খেলে। কেউ কাগজ কেটে রাখে, কেউ আঠা তৈরি করে। সব ঘরেই কিছু না কিছু কাজ হচ্ছে। সব ধরনের মুখোশ যে সবাই বানাতে পারেন, এমন নয়। মূলত পৌরাণিক কাহিনির ওপর ভিত্তি করেই হয় ছৌ পালা। রামায়ন, মহাভারত, মহিষাশূরমর্দিনী এগুলোই বেশি জন-প্রিয়। এইসব পালার বিভিন্ন চরিত্রের আলাদা আলাদা মুখোশ।
এই মুখোশগুলো কি শুধু ছৌ শিল্পীদের

জন্য? মোটেই না। আপনি–আমিও কিনতে পারি। ছৌ নাচ নাচতে নাই বা পারলেন। বাড়িতে সাজিয়ে রাখতে তো আপত্তি নেই। শহুরে অনেক বাড়িতেই শোভাবর্ধন করে এই মুখোশ। যাঁরাই অযোধ্যা পাহাড়ের দিকে আসেন, তাঁদের অনেকেই ঘুরে যান এই গ্রাম থেকে। শীতের এই সময়টায় পরিযায়ী পাখিদের মতোই বিদেশিদের আনা-গোনাও লেগেই থাকে। বিদেশিরা আসার আগে নেট ঘেঁটে এ তল্লাটের নানা হেরিটেজের কথা আগেই জেনে আসেন। আর সেই হেরিটেজের তালিকায় চড়িদা গ্রাম তো আছেই। তাঁরাও এই গ্রামে আসেন, ছবি তোলেন, ভিডিও তোলেন। কত তথ্যচিত্র যে তৈরি হয়েছে, তার হিসেব কে রাখে! দেশি–বিদেশি কোন ম্যাগাজিনে কোন ছবি ছাপা হচ্ছে, তার হদিশও পাওয়া মুশকিল। এভাবেই খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

গ্রামে এসেই অনেকে মুখোশ নিয়ে যান। আবার শীতের সময় রাজ্যের নানা প্রান্তে মেলা বসে। সেখানেও ডাক পড়ে শিল্পীদের। সেইসব মেলায় বিক্রি হয় ভালই। কখনও এজেন্ট মারফত নানা জায়গায় যায়। অনলাইনে কেনার সুযোগ নেই ঠিকই, তবে ফোনে অর্ডার দেওয়াই যায়। ফ্লিপকার্ট বা অ্যামাজন কি চড়িদার কথা জানে! জানলে হয়ত বিপণনের নতুন দরজা খুলে যেত। আরও বেশি করে ছড়িয়ে পড়তে পারত।

অন্তরা চৌধুরি

স্বপ্নে জড়ানো ছেলেবেলার চড়ুইভাতি

শীতকাল এলেই মনটা কেমন পিকনিক পিকনিক করে ওঠে। মনে হয় একছুটে চলে যাই কাছে-দূরে। কিন্তু পিকনিকের বদলে যদি বলা হয় চড়ুইভাতি, তাহলে অনেকের কাছেই ব্যাপারটা অচেনা ঠেকবে। কারণ চড়ুইভাতি বা বন ভোজন শব্দটার সঙ্গে আধুনিক প্রজন্ম তেমন পরিচিত নয়। এখনকার পিকনিক মানে তো কোনও বিশেষ জায়গায় দল বেঁধে বেড়াতে যাওয়া। খাওয়া দাওয়া নিয়ে নো টেনশন। তার জন্য ক্যাটারিং বা রান্নার ঠাকুর আছে।

থাকে রসনা পরিতৃপ্তির হরেকরকম আয়োজন। চিকেন পকোড়া থেকে বিরিয়ানি। ভাত বাঁধাকপির তরকারি মাং চাটনি-এসব সাবেকিয়ানার এখন নো এন্ট্রি। আর নিজেদের হাত পুড়িয়ে রান্নার করার তো কোনও গল্পই নেই। স্রেফ এনজয়মেন্ট।

কিন্তু এই পিকনিকে মজা কোথায়! এগুলো তো কর্পোরেট পিকনিক। নিজের হাতে রান্না না করলে কি আর পিকনিক জমে! বাঁধাকপিতে যদি একটু পোড়া গন্ধ না ছাড়ে, মাংসে যদি একটু বেশি নুন না হয় তাহলে আর পিকনিক হল কই! আমাদের ছোটবেলায় ছিল বনভোজন বা চড়ুইভাতি। আমরা যারা আশি নব্বইয়ের দশকে বেড়ে উঠেছি তারা ব্যাপারটা ভাল বুঝতে পারবেন। স্কুল বা টিউশনের বন্ধুরা মিলে মোটামুটি একটা কাছেপিঠে জায়গা ঠিক করে নেওয়া হত। সেই জায়গার তেমন কৌলীন্য না থাকলেও চলবে। কেবল একটু গাছপালা, পুকুর বা নদী আর নির্জনতা-এই ছিল ক্রাই-টেরিয়া। জিনিসপত্রের মোটামুটি একটা আন্দাজ দাম ধরে নিয়ে একটা নির্দিষ্ট চাঁদা তোলা হত। টিমে একজন বা দুজন ম্যানেজার গোছের থাকত। তারাই কেনাকাটার যাবতীয় দায়িত্ব সামলাতো। কোথায় ডিম, কোথায় কেক, তরি তরকারি, তেলমশলা ইত্যাদি। গাড়ি ভাড়া করে যাওয়া তো দূরে থাক ভাবার সামর্থ্যটুকুও ছিল না। তাই প্রাণের চেয়ে প্রিয় সাইকেলই ছিল তখন একমাত্র ভরসা। সেই বিশেষ দিনটির আগমনের অপেক্ষায় দিন গুনতাম। মনের ভেতর উত্তেজনার চোরাস্রোত বইত। তবে চড়ুইভাতি করার আগে বাড়ির লোকের কাছে পারমিশন নিতে বোধহয় সকলেরই বুক কাঁপত। সারাদিন পড়াশোনা বন্ধ করে বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক করতে যাওয়া ব্যাপারটায় বড়রা অতটা প্রশ্রয় দিত না। তাই আগের দিনগুলোতে সারাদিন পড়ার বিনিময়ে একটা দিন ছুটির ছাড়পত্র মিলত অনেক কষ্ট করে। আগে থেকে সবাই ঠিক করে নিত কে কোন জিনিসপত্র নিয়ে যাবে। সেই অনুযায়ী সবকিছু সাইকেলের পেছনে বেঁধে আগের রাত্রির থেকে রেডি করে রাখতাম।

তারপর শুরু হত আমাদের চড়ুইভাতি অভিযানের পালা। তখন ফোন ছিল না। তাই আগের যে যার মতো ভোর-বেলায় উঠে আধো আলো আধো অন্ধ-কারে কুয়াশা ঢাকা রাস্তা ধরে ঠান্ডার মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম সেই অচিনপুরের উদ্দেশ্যে। সেই বিশেষ জায়গায় পৌঁছে দেখতাম দলের ম্যানেজার আগেই

হাজির হয়ে গেছে। এক এক করে সকলেই এসে জমা হল। হাঁড়ি কড়াই বনের ভেতরে রেখে আমরা বেরিয়ে পড়লাম খেজুর রসের উদ্দেশ্যে। সব দলেই গেছো টাইপের একজন থাকে। সে-ই তরতর করে গাছে উঠে পেড়ে আনল হাঁড়ি ভর্তি খেজুর রস। পৌষের ভোরে এমন সুশীতল পানীয়ের কোনও তুলনা হয় না। রস পর্ব খাওয়া মিটে গেলে আমরা আবার ফিরে এলাম সস্থানে।

তারপর শুরু হল অপটু হাতে আমাদের সেই বনভোজনের প্রস্তুতি। কোন ওরকমে তিনটে বড় সাইজের পাথর এনে উনুন তৈরি হল। দুজন গেল জঙ্গলে শুকনো পাতা আনতে। কাঠ জোগাড় করতে। তারপর চাপানো হল চা। একটু একটু করে সূর্যের আলো স্পষ্ট হচ্ছিল। সোনাঝুরি গাছের ফুল থেকে টুপ টুপ করে ঝরছে শিশির। সরষে ফুলের সুগন্ধে জড়ানো সে এক স্বর্গীয় ভোর। অবশেষে ধোঁয়ার গন্ধ মাখা চা তৈরি হল। তখন অত বাছবিচার ছিল না। নিজেরা করেছি সেটাই বড় ব্যাপার। সেই হি হি ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে সেই চা পান করা হল। সঙ্গে ছিল বাপুজি কেক আর বাড়ি থেকে আগের রাত্রে সেদ্ধ করে রাখা ডিম। তারপর স্টিলের গ্লাস নিয়ে একজন বসে গেল বাঁধাকপি কাটতে। একজন বসে গেল পেঁয়াজ রসুন আদা ছাড়াতে। অত ভোরে মুরগি পাওয়া যায়নি। তাই একটু বেলা গড়াতেই আমাদের ম্যানেজার চলে গেল মুরগি কিনতে পাশের গ্রামে। প্রস্তুতি তো মোটামুটি হল। কিন্তু আদা পেঁয়াজ রসুন যে বেটে পরে মাংসে দিতে হয় সেকথা কারওরই খেয়াল ছিল না। কিন্তু তখন তো কিছু করার নেই। অবশেষে পাথরে পাথরে কোনও রকমে আধছেঁচা করা হল। ওদিকে তখন বেলা গড়িয়ে প্রায় দশটা বেজে গেছে।

জলখাবারে ছিল মুড়ি। আমাদের ম্যানেজার আসার সময় চপ নিয়ে এসেছিল। সামনের ক্ষেত থেকে তুলে আনা হল

টাটকা টমেটো। সেই সব মিশিয়ে বেশ জমিয়ে খাওয়া হল মুড়ি। সামনেই ছিল নদী। বালি সরিয়ে চুঁয়া খুঁড়ে জল খাওয়া হল সে যে কী আনন্দ বলে বোঝানোর নয়। জীবনে সেই প্রথম স্বাধীনতার স্বাদ বেশ চেটেপুটে সকলেই বেশ উপভোগ করেছিল।

রান্নায় কেউই তেমন পারদর্শী না হলেও মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল। কারণ আমরা তখন এখনকার বাচ্ছাদের মত এত প্যাম্পারড ছিলাম না। তাই টুকটাক রান্না কাজকর্ম আমরা সেই বয়সেও শিখে গিয়েছিলাম। দুপুর আড়াইটে নাগাদ মোটামুটি সব খাবার তৈরি হয়ে গিয়েছিল। খুব যে খারাপ হয়েছিল তা বলা যাবে না। বরং প্রয়োজনের তুলনায় কিছু ভালোই হয়েছিল। গাছ থেকে টাটকা শাল পাতা পেড়ে থালা তৈরি করা হল। আমরাও নদীর জলে স্নানটান সেরে সবাই রেডি। বনভোজনের নিয়ম হল সব খাবার একটু একটু করে নিয়ে থালায় সাজিয়ে আগে বনবুড়িকে দিয়ে আসতে হয়। আমরাও সেইমতো সমস্ত খাবার সাজিয়ে বনের এক জায়গায় বন-বুড়িকে দিয়ে এলাম। তারপর আমাদের খাওয়ার পালা। সকলেই বেশ কব্জি ডুবিয়ে ভরপেট খেলো। মাংসটা ওই আধছেঁচা মশলা দেওয়ার ফলে বেশ অসাধারণ হয়েছিল।

খাওয়া দাওয়ার পর্ব চুকিয়ে আমরা নদীর ধার, সরষে ক্ষেত ফাঁকা হয়ে যাওয়া ধানজমিতে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াই। কচি কাঁচা কিশোর কিশোরীদের কলতানে ভরে ওঠে সেই মৌন প্রকৃতি। তখন সেলফি ছিল না। তাই ছবি নেই। মনের ক্যামেরাতেই সেই ছবি আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। ইচ্ছে ছিল প্রত্যেক বছর এমন চড়ুইভাতি করব। কিন্তু জীবনের দাবি সবার থেকে বেশি। তাই ওইরকম বনভোজন আর কখনও করা হয়নি। উঠতি বয়সে হয়তো অনেক পিকনিক করেছি। কিন্তু সেখানে সেই সারল্য ছিল না। তাই আজও ফিরে পেতে ইচ্ছে করে সেই ফেলে আসা দিন। হয়তো সেই অচিনপুরে নাম না জানা নদীর ধারে সরষে ক্ষেতের পাশে আজও পড়ে আছে আমাদের সেই ফেলে আসা কিশোরীবেলা।

গল্প

ক্ষত

কুমকুম বসুদাস

আমার ডাইনিং রুমের আয়নাটা খুব সুন্দর। বাবা বলতেন, 'বেলজিয়ামের কাচ। যত্ন করিস'। মুছি কলিন্স দিয়ে। একটু ঘষাতেই চকচককরে। ওতে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বগুলো যেন কথা বলে। মেহগনি ব্রাউন ফ্রেমটা ওর জৌলুস আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রচুর গেষ্ট আসে আমার বাড়িতে। খানাপিনা লেগেই থাকে। সুক্তি –শশাঙ্ক, অমল–মঞ্জু, কাবেরী–স্নেহাশিস, আরও কত কে। আমি

আয়নার সামনে বসে দেখি ওদের হাসিঠাট্টার প্রতিচ্ছবি গুলো। আনন্দে উল্লাসে ভরে ওঠে ঘরটা।

এমন সময় মোবাইলটা বেজে ওঠে। ডিসগাস্টিং। এমন আনন্দ-মুহূর্তেকে রসভঙ্গ করতে চাইছে। সুইচ অফ করে দিই। অনভিপ্রেতর কন্ঠরোধ করার মধ্যে বেশ একটা বিজয়ীর উল্লাস আছে। দেখি আয়নায় আমার উল্লসিত দৃষ্টির প্রতিফলন।

মাত্র দু পেগ। তাতেই উত্তেজিত আমি। আয়নার ভাষা পড়তে পারি এই আধধরা নেশাতেই। রাত বাড়ে। এবার গুডনাইটের পালা। একে একে চলে যায় সবাই।

আয়নাটা পড়ে থাকে একভাবে। আমাকে কাছে ডাকে ইশারায়। চোখ আধঘুম। নেশায় বিভোর আমি। আবার ফোনটা বাজছে। আবার সুইচ্ অফ। আয়নায় পড়ে প্রতিবিম্ব। কুসুম! সিক্ত চোখ, খোলা চুল, সাদা শাড়ি। পিছন ফিরে দেখি কেউ কোথাও নেই। আয়নাটা তুলে এক ঘুষিতে আছাড় মারলাম। বিকট শব্দে উপুড় হয়ে পড়ল সে। মনে পড়ল বাবার কথা— ‘যত্ন করিস’।

দু’হাতে সোজা করে তুলে দেখি, একটা বড় স্ক্যার্চ পড়ে গেছে। কুসুমের প্রতিবিম্ব দু’ভাগে। ওর জলভরা চোখ দুটো সস্নেহে মুছিয়ে দিলাম। মাথায় বুলিয়ে দিলাম হাত। ভাঙা কাচের ঘষায় হাত হল রক্তাক্ত। সে রক্তের ধারাগড়িয়ে পড়ে রাঙিয়ে দিল কুসুমের সিঁথি।

অ-আ-ক-খ

কুণাল দাশগুপ্ত

জীবনের যত কোলাহল সব অ্যালকোহলেই খুঁজে পেত সবুজ। কাব্য করে বলত, কত সন্ধ্যা রঙিন হয় লাল রঙের এই জলে, কত গ্লাসের গায়ে জমে কত আবেগের বিন্দু।

এই বিলাসিতাকে এক ইঞ্চিও প্রশ্রয় দিতে চায়নি তার চাকরিরতা স্ত্রী অনসূয়া। অশান্তির বর্ষা অমঙ্গল ডেকে আনত প্রতি রাতে। নিয়ম করে।

দূরত্ব ছিল আরও একটা বিষয়েও। রাজনীতি। সবুজের বাম বিরোধিতা ছিল অকৃত্রিম। সর্বহারা, শ্রেণিহীন সমাজ জাতীয় শব্দগুলো গা জ্বলিয়ে দিত তার। উল্টোদিকে অনসূয়া বাম কর্মচারী সংগঠনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। মিটিং, মিছিল তার কাছে সঙ্গীতশিল্পীর গলা সাধার মতো নিত্য দিনের কাজ।

অশান্তি, ঝগড়ার অন্তাক্ষরী চলার সময়ে কখনও কখনও অনসূয়ার অ-আ-ক-খ সিরিজের বাম বইগুলো ছুঁড়ে ফেলেছে। অশালীন শব্দ প্রয়োগ করে সমাজতন্ত্রের অসারতার কথাও বুঝিয়েছে। বুঝিয়েছে চৌত্রিশ বছরের বাম রাজত্ব রাজ্যকে

সাড়ে বত্রিশভাজা করেছে। অনসূয়াও বলেছে, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, ক্ষুদ্র শিল্প, ভূমি সংস্কার, পঞ্চায়েত, কৃষিতে এই রাজ্যটাই এগিয়েছিল। আসলে, বাম বিরোধিতা করতে গেলে লেখাপড়া না করলেও চলে। কিন্তু সমর্থন করতে গেলে একটু আধটু পড়তে হয়। তোমার বিজ্ঞান জ্যোতিষ আর জড়িবুটি। আমার বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ।

সবুজ লম্বা। ছিপছিপে। বেসরকারি কোম্পানির মার্কেটিং বিভাগের জিএম। বৈভবের চিলেকোঠায় বসে রয়েছে।

আরও একটা গুন রয়েছে। মেয়েদের মনকে প্রভাবিত করতে পারে 'ঘরে–বাইরে'র সন্দীপের মতোই। সুতপার মনে হানাদারি চালিয়েছে একেবারে এক্কেবারে সবুজীয় কায়দায়। শরীর–মন দুটোই মাখামাখি করেছে দুজনে। পার্ক স্ট্রিটের হোটেলগুলো প্রতি সন্ধ্যায় সত্যযুগের বৃন্দাবন হয়ে যেত। প্রাচ্যের আরব্য রজনী বললেও অত্যুক্তি হয় না।

অন্যদিকে, অনসূয়া মন দিয়েছিল রাজনীতি আর তাদের দশ বছরের ছেলে অনীকের লেখা পড়ার বিষয়ে। আসলে, কাটখোট্টা রাজনীতির পাশাপাশি সংসারে শান্তির ফুল ফোটানোরও একটা স্বপ্ন ছিল তার। অফিস, রাজনীতি আর ছেলে মানুষ করাই ছিল অনসূয়ার জীবনের সিম্ফনি।

সুর ছিটকালো, যখন জানতে পারল

সবুজ–সুতপার ব্যকরণ বহির্ভুত সম্পর্কের কথা। সেদিনই হৃদয়ের ঝাঁপ ফেলে দেয় সে। তারপর একদিন সরকারি তালা। ডিভোর্স হয়ে যায়।

ধীরে ধীরে পচন ধরে সবুজ–সুতপার কৃত্রিম প্রেমে। সবুজও বুঝতে পারে, বউ আর 'বউয়ের মতো'র মধ্যেকার ফারাকটা।

অতিরিক্ত মদের ফলে বিবর্ণ হয়েগিয়েছিল সবুজের স্নায়ুগুচ্ছ। অবসাদ আর অপরাধবোধ পিশাচের নৃত্য চালিয়ে যায় মনের মধ্যে। বুঝতে পারে সর্বহারা কাকে বলে।

বড্ড মনে পড়েছে অনসূয়ার কথা। অতঃপর কড়া নাড়ে প্রাক্তন হয়ে যাওয়া শ্বশুরবাড়ির দড়জায়। শীর্ণকায় সবুজ অনসূয়াকে বলে, শেখাবে একটু বাম রাজনীতির অ-আ-ক-খ?

বেঙ্গল টাইমস

অপু থেকে হরিহর হরিহর থেকে অপু

ময়ূখ নস্কর

হরিহর ল্যাপটপ খুলিয়া অফিসের বকেয়া কাজ শেষ করিতেছিল- এমন সময় সর্বজয়া অপুকে লইয়া গিয়া বলিল, ওগো ছেলেটাকে একটু ধরো না?... ধরো দিকি একটু! হরিহর বলে- উঁহু, ওসব গোলমাল এখন এখানে নিয়ে এসো না, বড় ব্যস্ত। সর্বজয়া রাগিয়া ছেলেকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়।

খোকা মাত্র দুইটি কথা বলিতে শিখিয়াছে। মনে সুখ থাকিলে মুখে বলে জে-জে-জে-জে এবং দুধে-দাঁত বাহির করিয়া হাসে। মনে দুঃখ হইলে বলে, না-না--না-না।

হরিহর কাজ করিতে করিতে হঠাৎ দেখে ছেলে তাহার মোবাইলটা মুখে লইয়া চুষিতেছে। হরিহর ফোনখানা কাড়িয়া লইয়া বলে, আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!

হঠাৎ একটা চড়ুই পাখি আসিয়া হরিহরের ফ্ল্যাটের একফালি বারান্দায় বসে। শহরে চড়ুই পাখি আজকাল দুর্লভ। খোকা বাবার মুখের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া সেদিকে দেখাইয়া হাত নাড়িয়া বলে- জে-জে-জে-জে- হরিহরের বিরক্তি দূর হইয়া গিয়া ভারি মমতা হইল।

অনেক দিন আগের কথা তাহার মনে পড়িল। তখন হরিহর নিজেই অপু ছিল। আর তাহার বাবা ছিলেন হরিহর।

কয়েকদিন জ্বরে ভোগার পর অপু (আজকের হরিহর) বিছানায় শুইয়া ছিল। খেলা বন্ধ, তাই গৃহবন্দি হইয়া বোর হইতেছিল। তাহার বাবা অফিস হইতে ফিরিয়া একটা প্যাকেট তাহার হাতে দিয়া বলিলেন- দ্যাখো তো খোকা, কি বল দেখি?

অপু তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিল; উৎসাহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল- নতুন বই? না বাবা?

অপু তখনও একা একা বই কিনিতে শেখে নাই। কলেজ স্ট্রিট তাহার কাছে রাজপুতানার মরুপর্বত কি দিল্লি-আগ্রার রংমহলের মতোই দূরদিগন্তের কোনও অজানা দেশ। তাহার

বাবাই তাহার জন্য বই কিনিয়া আনে।
অপু বাবার হাত হইতে তাড়াতাড়ি প্যাকেটটা লইয়া দেখিল- বড় বড় অক্ষরে 'পথের পাঁচালি' কথাটা লেখা। সে বলিল, এটা কি ছোটদের বই বাবা?
তাহার বাবা জানিতেন না। তিনি কখনও সম্পূর্ণ পথের পাঁচালি পড়েন নাই। কিন্তু স্কুলের সিলেবাসের বাহিরেও যাহা কিছু শিখিবার আছে ছেলেকে তাহা শিখাইবার জন্য তাঁহার একটা অদম্য অপ্রশমনীয় পিপাসা।

তখনকার বাবারা এমনটাই ছিলেন। তাহারা ভাবিতেন, এই বই তাহার সন্তানকে অপরের দুঃখে চোখের জল ফেলিতে শিখাইবে, মার্কশিটের নম্বরের মূল্য কি ইহার চাইতেও বেশি?
তখনকার বিদ্যালয়গুলিও ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। সেখানে প্রসন্ন গুরুমশাইদের সন্ধান মিলিত। যাঁহারা শাসনের সময় দণ্ডপাণি হইলেও, শ্রুতিলিখনের সময়, 'জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরির' বর্ণনা শুনাইয়া, পড়ুয়াদের কচি কর্ণে মহামধুর কুহকের সৃষ্টি করিতেন, নীলকুন্তলা সাগরমেখলা ধরণীর সহিত তাহাদের পরিচয় করাইয়া দিতেন।
তখনকার খোকা খুকিরাও অন্য প্রকারের ছিল। ভিডিও গেমস না খেলিয়া তাহারা কুঠির মাঠে নীলকণ্ঠ পাখি দেখিতে যাইত, তাহাদের বাবা তাহাদের লইয়া যাইতেন, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার না হইয়া তাহারা রাজু রায়ের ন্যায় আষাঢ়ুর হাটে তামাকের দোকান খুলিতে চাহিত। তখন তাহারা নির্জন দুপুরে, মায়ের পাশে শুইয়া চাঁদের পাহাড় পড়িত। যাহারা পড়িতে শেখে নাই, তাহাদের মায়েরা দিদি নাম্বার ওয়ান না দেখিয়া সন্তানকে পড়িয়া পড়িয়া শোনাইতেন।

অনন্ত কালপ্রবাহের সহিত পাল্লা দিতে গিয়া সেইসব দিন কুটার মতো, ঢেউয়ের ফেনার মতো ভাসিয়া গিয়াছে। ইছামতির চলোর্মিচঞ্চল স্বচ্ছ জলধারা কচুরিপানার দামে মজিয়া গিয়াছে। সিলেবাসের অন্ধকূপে মুখ ঢাকিয়া পথের পাঁচালির নির্বাচিত অংশ বাধ্যতামূলক হইয়াছে। পরীক্ষার নোট মুখস্থ করিতে করিতে আজকের অপুরা ক্রমে হরিহর হইয়া ওঠে।
নোট মুখস্থ করিতে করিতে রাত্রি গভীর হয়। হেমন্তের আঁচ লাগা শিশিরার্দ্র নৈশ বায়ুর প্রবেশ

রোধ করিয়া এসি-র বাতাসে ভরিয়া যায় তাহাদের বেডরুম। সভ্যতার চোখ-ধাঁধানো, অশোভন আলোয় কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্না আপন অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। আলো আঁধারের অপরূপ মায়ায় পূর্ণ যে রাত ঘুমন্ত পরীর দেশের মত রহস্যে ভরা, তাহা অপুদের অগোচরেই থাকিয়া যায়।

তবুও এক এক দিন এমন সময় অপুর ঘুম ভাঙিয়া যায়। শনশন করিয়া হঠাৎ এক ঝলক হাওয়া ড্রয়িং রুমের সৌখিন পর্দা উড়াইয়া বহিয়া যায়। কোথা হইতে ছাতিম ফুলের উগ্র সুবাস ভাসিয়া আসে। অপুর মনে হয়, সেই কবি যেন আসিয়াছেন, ঔপন্যাসিক নন কবি, পথের কবি, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অপুরা তাহাকে ভুলিতে বসিলেও, তিনি কিন্তু অপুদের ভোলেন নাই। হরিহরদের ভোলেন নাই। প্রয়াণের ৫৫ বছর পরেও তিনি তাহাদের সোনাডাঙার মাঠে, মধুখালির বিলে, ধলচিতের খেয়াঘাটে, সলতেখাগি তলায় লইয়া যান। মাঝেরপাড়া স্টেশনে লইয়া যান। লোকজন, তামাকের গাঁট, হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা হিরু গাড়োয়ান, সকলকে পিছনে ফেলে যে রেলগাড়ি বাহিরের উলুখড়ের মাঠ চিরিয়া ছুটিয়া গিয়াছিল, তাহাকে তিনি আবার মাঝেরপাড়া স্টেশনে ফিরাইয়া আনেন। বালক পুত্রের হাত ধরিয়া যুবক অপু আবার নিশ্চিন্দিপুরে ফিরিয়া আসে।

হরিহর ঘুম ভাঙিয়া ওঠে। ল্যাপটপ ফেলিয়া ওঠে।

মোবাইল লইয়া ক্রীড়ারত নিজের সন্তানের চোখের দিকে তাকাইয়া নিজের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পায়। মনে পড়িয়া যায় অমল শৈশবের কথা, তাহার নিজস্ব এক নিশ্চিন্দিপুরের কথা।

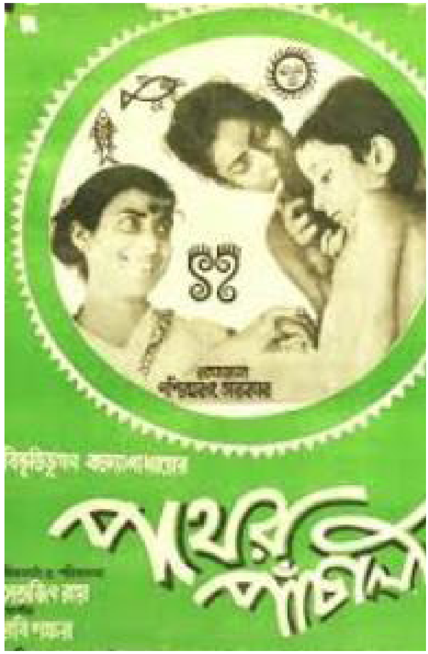

আজ কতদিন সে সেই নিশ্চিন্দিপুর দেখে নাই! কতকাল!

হঠাৎ সে কাঁদিয়া আকুল হয়। উচ্ছ্বসিত চোখের জল ঝর-ঝর করিয়া তাহার কপোল ভাসাইয়া দেয়, চোখ মুছিয়া হাত উঠাইয়া আকুল সুরে মনে মনে বলে- আমার যেন নিশ্চিন্দিপুরে ফেরা হয়, আমার সন্তান যেন নিশ্চিন্দিপুরে যেতে পারে – হে বিভূতিভূষণ- তুমি এই কোরো, আমাদের ঠিক যেন নিশ্চিন্দিপুরে যাওয়া হয়-পায়ে পড়ি তোমার-

পথের কবি প্রসন্ন হাসেন। কোনও কথা না বলিয়া হাত তুলিয়া তাহাকে আহবান জানান, ধুলো পড়া বইয়ের তাকের দিকে। ইছামতীর দিকে, আরন্যকের দিকে, চাঁদের পাহাড়ের দিকে, মিসমিদের কবচের দিকে... পথের পাঁচালির দিকে...

হরিহর ল্যাপটপ বন্ধ করিয়া, অপুকে লইয়া সেইদিকে এগিয়ে যায়।

সাম্য এসে গেল! মোটেই না

মুকুল নন্দী

এই দেশ মহিলা প্রধানমন্ত্রী দেখেছে সেই ছয়ের দশকে। এই মুহূর্তে দেশের রাষ্ট্রপতি একজন মহিলা। আমাদের তিন পড়শি দেশ পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কাতেও নানা সময়ে মহিলা রাষ্ট্রপ্রধান দেখা গেছে। মহিলারা মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছেন। 'অপারেশন সিন্দুর' এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, বিনোদন, খেলা—সব বিভাগেই মেয়েরা লড়ছেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।

এবার মেয়েদের ক্রিকেটেও ভারতের মাথায় উঠল বিশ্বজয়ের মুকুট। আগে দু'বার ফাইনালে

উঠলেও শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা এই প্রথম। নিছক একটি ট্রফি নয়, এই কাপ জয়ের তাৎপর্য আরও অনেক বেশি। তিরাশির বিশ্বকাপ যেমন গোটা দেশে ক্রিকেটের জোয়ার এনেছিল, মহিলাদের এই বিশ্বজয়ও হয়তো ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনার দরজা খুলে দিল।

কিন্তু তারপরেও কিছু প্রশ্ন, কিছু সংশয়। শহরে মেয়েদের ক্রিকেট খেলার হয়তো চল রয়েছে, কিন্তু গ্রাম বা মফস্বলে একজন মেয়ের পক্ষে ক্রিকেট ব্যাট হাতে তুলে নেওয়া মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। এই দলের যাঁরা তারকা, সেই হরমনপ্রীত কাউর, স্মৃতি মানধানা, রিচা ঘোষ— সবাইকেই ছেলেদের সঙ্গে খেলেই উঠে আসতে হয়েছে। ছোট শহর বা মফস্বলে মেয়েদের আলাদা দল তৈরি হবে, এই ছবিটা এখনই দেখা যাচ্ছে না।

এবার আইসিসি একধাক্কায় পুরস্কারমূল্য অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এর বাইরে ফারাক অনেকটাই। একসময় দেশের হয়ে খেললে ম্যাচপিছু মাত্র হাজার টাকা পেতেন ক্রিকেটাররা। এখন দেশের হয়ে খেলার ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলাদের পারিশ্রমিক সমান। কথাটা শুনতে ভাল। কিন্তু দেশের হয়ে কতটুকুই বা খেলার সুযোগ রয়েছে? মিতালি রাজ ও ঝুলন গোস্বামী। ভারতীয় ক্রিকেটের দুই কিংবদন্তিই প্রায় দুই দশক ধরে দেশের হয়ে খেলেছেন। অথচ, তাঁরা দুজনেই মাত্র ১২টি করে টেস্ট খেলেছেন। বোর্ডের গ্রেডেশনেও পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে বিস্তর ফারাক। ছেলেদের আইপিএল এবং মেয়েদের ডব্লুপিএল। দুই লিগের মধ্যেও বৈষম্য মারাত্মক। মেয়েদের নিলামে সর্বোচ্চ দর দু'কোটিরও কম। আর ছেলেদের নিলামে সেটাই ২৭ কোটি। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ফলে হরমনপ্রীত, স্মৃতি, সেফালিদের কাছে অনেক বিজ্ঞাপনের প্রস্তাব হয়তো আসবে। কিন্তু সেই পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে ছেলেদের সঙ্গে অনেকটাই ব্যবধান থেকে যাবে।

উপরতলার কিছু তথ্য ও পরিসংখ্যান দেখলে মনে হবে ছেলে ও মেয়েদের ক্রিকেটে অনেকটাই সাম্য রয়েছে। কিন্তু যত নীচের দিকে নামবেন, বৈষম্য যেন ততই প্রকট। শুধু দেশের বা ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট নয়, ঘরোয়া ক্রিকেটকে আরও বেশি করে মর্যাদা দিতে হবে। জেলায় জেলায় আরও অনেক প্রতিভা ছড়িয়ে আছে। তাঁদের আরও যত্ন নিয়ে তুলে আনতে হবে। ঘরোয়া ক্রিকেটেও পারিশ্রমিক যেন আরও বাড়ানো হয়। এই দুরন্ত সাফল্যের পর সরকারিস্তরে কৃতী খেলোয়াড়দের কর্মসংস্থানও বাড়াতে হবে। এই দুরন্ত সাফল্যের পর টিভি সম্প্রচারের সুযোগ যেমন বাড়বে, তেমনই নতুন নতুন স্পনসরও বাড়বে। এই সুযোগটাকে ভারতীয় বোর্ড যেন ঠিকঠাক কাজে লাগাতে পারে। একটা জয় রাতারাতি সাম্য এনে দেবে, এতখানি আশা করাটা বাড়াবাড়িই হবে। কিন্তু বৈষম্য যতটা সম্ভব কমিয়ে মেয়েদের ক্রিকেটকে আরও পাদপ্রদীপের আলোয় আনার জোরালো চেষ্টার শুরুটা হোক এখন থেকেই।

কে বলে গম্ভীর ব্যর্থ?

রক্তিম মিত্র

রোগটা নতুন নয়। বেশ পুরনো। ঘরের মাঠে ঘূর্ণি উইকেট বানাও। তারপর বিপক্ষের ব্যাটসম্যানদের দিকে স্পিনার লেলিয়ে দাও। ব্যস, দুরন্ত ঘূর্ণি, এই লেগেছে পাক। স্পিনের ভেল্কিতে কুপোকাত হয়ে একে একে সবাই প্যাভিলিয়নের পথে হাঁটা দেবে। এই ফর্মুলায় দেশের মাঠে কত টেস্ট, কত সিরিজ যে আমরা জিতেছি!

বেচারা গৌতম গম্ভীর। তাঁর আর দোষ কোথায়! মহাজ্ঞানী জন যে পথে করেন গমন, তিনিও সেই পথেই হেঁটেছেন। পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। তিনি বলতেই পারেন, সব পাখি মাছ খায়, দোষ হয় মাছরাঙার।

তফাতটা হল, সেদিন ভারত বিদেশের মাটিতে হারলেও দেশের মাটিতে হেঁসেখেলে টেস্ট জিতত, সিরিজ জিতত। আজ বিদেশের মাটিতে, সবুজ উইকেটে তবু লড়াই করা যাচ্ছে। কিন্তু দেশের মাটিতে মাথা নিচু করেই মাঠ ছাড়তে হচ্ছে। তফাতটা কোথায়? সেই মানের স্পিনার নেই? স্পিনার কি কম পড়িয়াছে? এটা ঘটনা, অনিল কুম্বলে, হরভজন সিংদের সঙ্গে ওয়াশিংটন সুন্দর, অক্ষর প্যাটেলদের তুলনা অনেকটা সাতের দশকের ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর এই ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতোই। আসল কারণ হল, স্পিনার তেমন কম

পড়ে নাই, বরং স্পিন খেলার লোক কম পড়িয়াছে।

তখন ভারত জিতত, তার বড় কারণ ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা স্পিন খেলতে জানতেন। আব্দুল কাদির, শেন ওয়ার্ন, মুরলিথরণের মতো কিংবদন্তিরাও ভারতীয় ব্যাটারদের কাছে তেমন ত্রাস হয়ে উঠতে পারেননি। কিন্তু এখন মাঝারি মানের স্পিনাররাও কিনা লেজে গোবরে করে ছাড়ছেন। টেস্ট খেলার প্রথম শর্ত হল ধৈর্য। কিন্তু আইপিএলের আবহে বেড়ে ওঠা এই প্রজন্মের ধৈর্যের বড়ই অভাব। টানা তিনটি বা চারটি বল ডিফেন্স করলেই যেন হাত নিসপিস করে। মনে হয়, কখন ছক্কা হাঁকাব। নিন্দুকেরা বলেন, এখন ভারতীয়দের উইকেট কষ্ট করে আর নিতে হয় না। ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা সত্যিই অতিথি পরায়ণ। তাঁরা বোলারদের কষ্ট দিতে চান না। তাই, কয়েক ওভার খেলেই উইকেট উপহার দেন।

সত্যিই তো, ব্যাটসম্যানরা যদি সাধারণ স্পিনটুকু খেলতে না পারেন, তাহলে গৌতম গম্ভীর কীই বা করবেন! ইডেনে হাতে তিন দিন বাকি। তুলতে হবে মাত্র ১২৪ রান। তবু সকলের কী তাড়া! যেন বিমান স্টার্ট দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ম্যাচ শেষ করেই

উঠে পড়তে হবে। টি২০ তেও যদি এই রান তুলতে হত, তাহলেও ব্যাটসম্যানরা হয়তো এতখানি বেপরোয়া হতেন না। কিন্তু এখানে 'কেবা আগে প্রাণ/করিবেক দান/তারি লাগি তাড়াতাড়ি।'

এখানেই কোচের ভূমিকা। তিনি কী চাইছেন, সেটা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া। কী চাইছেন না, সেটা আরও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া। ঘরের মাঠে অধিনায়ক, কোচেরা পছন্দের উইকেট চেয়েই থাকেন। কিন্তু কিউরেটরের ওপর এমনভাবে চাপ তৈরি করেন না। একসময় নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলে গেছেন বলে ভেবে নিয়েছেন ইডেন তাঁর মামার বাড়ি। কেউ পিচের ওপর হামাগুড়ি দিলেন, কেউ শুয়ে পড়লেন। যেন কতই না পিচ বোঝেন! যেখানে সৌরভ গাঙ্গুলির মতো মানুষ ইডেনের দায়িত্বে, সেখানে এত পাকামি বা এত বাহাদুরি করতে নেই, এই বোধটুকুও নেই।

টেস্টে সীমাহীন ব্যর্থতার প্রসঙ্গ উঠলেই কেউ কেউ শিয়ালের কুমিরছানা দেখানোর মতো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, টি২০ এশিয়া কাপের কথা টেনে আনেন। কী জানি, ঘরের মাঠে দুর্বল ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সিরিজ হারানোর ঘটনাকেও হয়তো বিরাট করে দেখানো হবে। লাল বল আর সাদা বলের ঘরানায় যে আকাশ-পাতাল তফাত, এই সহজ সত্যিটা গম্ভীরবাবুকে কে বোঝায়! ইডেনে ব্যাটসম্যানেরা যেভাবে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন, গুয়াহাটিতেও সেই রোগ সারল না। যে যাঁর মতো আসছেন, উইকেট ছুঁড়ে চলে যাচ্ছেন। যাঁর সবথেকে বেশি দায়িত্বশীল হওয়ার কথা, সেই অধিনায়ক ঋষভ পন্থ যেন সবথেকে বেশি দায়িত্বজ্ঞানহীন হওয়ার মহান দায়িত্ব নিয়ে ফেলেছেন।

যাঁকে পারছেন তিন নম্বরে পাঠাচ্ছেন, আবার পরের ম্যাচেই একলাফে আট নম্বরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। কাউকে কিলিয়ে কাঠাল পাকানোর মতো জোর করে অলরাউন্ডার বানাতে চাইছেন। তিনি বলছেন, কিউরেটরের দোষ নেই, এমন উইকেটই আমরা চেয়েছিলাম। আবার ব্যাটিং কোচ এসে বলে যাচ্ছেন, এটা কোচের মনের কথা নয়। তিনি মোটেই এমন উইকেট চাননি। কে যে সত্যি বলছেন, বোঝা মুশকিল।

এমন কতকিছুই গুলিয়ে যায়। এমন কতকিছুই গুলিয়ে যাওয়ার সময়। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ০-৩ হার। ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও হোয়াইটওয়াশ। তারপরেও সমালোচনা করা যাবে না। করলেও মেপে করতে হবে। যদি প্রভুরা রেগে যান!

আসল অপদার্থ কে, তিনি বুঝিয়েই দিলেন

হরিশ মুখার্জি

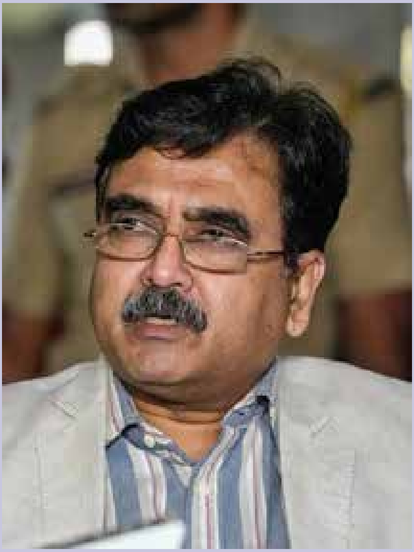

সহজ কথা যায় না বলা সহজে। কিন্তু তিনি এত মারপ্যাঁচ বোঝেন না। সহজ কথাটা একেবারে সহজেই বলে দিয়েছেন।

অভিজিৎ গাঙ্গুলি যখন হঠাৎ করে হাইকোর্টের ইনিংস থেকে ডিক্লেয়ার করলেন, তখনই বোঝা গিয়েছিল, যেখানেই যান, বেশিদিন তাঁর পক্ষে সেখানে থাকা সম্ভব হবে না। যাঁরা তদন্ত বছরের পর বছর ঝুলিয়ে রাখে, সেই মঞ্চে থেকে তিনি লড়াই করতে পারবেন না। একসময় তাঁদের প্রতিও মোহভঙ্গ ঘটবে। ঘটবেই।

বছর ঘুরতে না ঘুরতে, সেটাই দেখা গেল। সিবিআই, ইডি যে কাজের কাজ কিছুই করছে না, সেটা তিনি বিচারপতির চেয়ারে বসেই বুঝতে পেরেছিলেন। বারবার সতর্ক করেছিলেন। কখনও ভর্ৎসনাও করেছিলেন।

অন্তত এই বাংলার ক্ষেত্রে সিবিআই বা ইডি যে ভূমিকা পালন করে চলেছে, সেটাকে ব্যর্থতাও বলা যায় না। অপদার্থতাও বলা যায় না। এই শব্দগুলোও যেন কম পড়ে যায়। দু-একটা লোকদেখানো তল্লাশি, লোক দেখানো গ্রেপ্তার। দৌড় এই টুকুই। তাতে পাসমার্ক তো দূরের কথা, একশোয় দশ নম্বর দেওয়াও কঠিন। তারপর তাঁরা যে ভূমিকা পালন করেন, তার জন্য সিবিআই, ইডি হওয়ার দরকার নেই। যে কোনও থানার যে কোনও সিভিক ভলান্টিয়ারও তার থেকে ভাল তদন্ত করতে পারতেন।

যাই হোক, গলদটা তাহলে কোথায়? কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেন, সিবিআই এর কোনও

কোনও অফিসার এই তদন্তে ঢিলেমি দিচ্ছেন। কোনও কোনও অফিসার দুর্নীতিগ্রস্থ। অভিজিৎবাবুও শুরুতে এমনটাই বলেছিলেন। তিনি একটি দলের সাংসদ। কিছু রীতিনীতি মেনে চলতে হয়। বুঝতে পারলেও সবকিছু প্রকাশ্যে বলতে নেই, বলা যায় না। কিন্তু একটা সময় তাঁরও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেই গেল। তিনিও সেই মৌচাকে ঢিল মেরেই বসলেন।

না, এটা কোনও সিবিআই-এর অপদার্থতা নয়। সিবিআই যে ভূমিকা পালন করে, তা যে কোনও ক্রিমিনালের থেকেও ঘৃণ্য। কিন্তু এটাও ঠিক, কেন্দ্র চায় বলেই তারা ঘুমিয়ে থাকে। যে সিবিআই বাড়ির পাঁচিল টপকে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরমকে গ্রেপ্তার করতে পারে, সেই সিবিআই এই রাজ্যে ছেঁচো মস্তানদের ছুঁতে পারে না! একের পর এক চুনোপুঁটিও প্রমাণের অভাবে জামিন পেয়ে যায়। বেরিয়ে এসে ভাষণ দেয়, সত্যের জয় হল। তখন এই সিবিআই-এর প্রতি

একরাশ ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই হয় না। মনে হয়, এঁদের থেকে জঙ্গিরাও অনেক ভাল।

সহজ কথা, সিবিআই ঘুমিয়ে থাকে। কারণ, তাঁদের ঘুমিয়ে থাকতে বলা হয়। কে বলেন? এই সহজ সত্যিটা কার্যত ফাঁস করে দিলেন অভিজিৎ গাঙ্গুলি। বিরোধীরা যা খুশি বলতেই পারেন। কিন্তু বিজেপির একজন সাংসদ হয়ে এতবড় কথাটা বলতে গেলে বুকের পাটা লাগে বইকি। অভিজিৎবাবু যেটা বলেছেন, সেটা হয়তো শুভেন্দুবাবুরও মনের কথা। কী জানি, হয়তো সুকান্ত মজুমদার, শমীক ভট্টাচার্যরাও মনে মনে এমনটাই বলছেন। যাঁরা এই রাজ্যে বিজেপিকে সত্যিই ভালবাসেন, যাঁদের একটু হলেও পড়াশোনা ও বিচারবুদ্ধি আছে, তাঁরা সবাই বুঝছেন, সিবিআই কেন ঘুমিয়ে থাকে।

ঘৃণা যদি করতেই হয়, ভুইফোঁড় ভাইপো বা তাঁর পিসিকে নয়। যে লোক দুটো সিবিআই বা ইডিকে এতখানি অপদার্থতার স্তরে নামিয়ে এনেছেন, তাঁদের করুন। ধন্যবাদ অভিজিৎবাবু, সহজ কথাটা এত সহজভাবে বলার জন্য। আপনি প্রণম্য ছিলেন, আছেন, থেকেও যাবেন।

ফিরে দেখা

আশির দশক

কিশোর মনে ঝড় তোলা সেই ‘শত্রু’

বেঙ্গল টাইমসের জনপ্রিয় বিভাগ আশির দশক। উঠে এল তখনকার একটি হিট ছবির কথা। সেই ছবিকে ঘিরে অনেক নস্টালজিয়ার কথা। শিশুমনে কত প্রশ্ন ও মুগ্ধতার কথা। লিখেছেন সুমিত চক্রবর্তী।।

কোন ছবির কে পরিচালক, কে চিত্রনাট্যকার, এসব বোঝার মতো বয়স তখন হয়নি। সদ্য বেড়ে ওঠা। শৈশব ছাড়িয়ে কৈশোরেও তখনও আসিনি। তখন যে নায়ক, তারই সিনেমা। আড়াল থেকে কে গাইছে, জানার দরকার নেই। সিনেমায় যাকে দেখাচ্ছে, এটা তারই গান। কী সুন্দর ছিল সেই দিনগুলো। কোন সিনেমার কী বার্তা, কোন দৃশ্য কতটা রোমান্টিক, এসব বুঝতে বয়েই গেছে। যে সিনেমায় যত মারপিট, সেই সিনেমা তত ভাল।

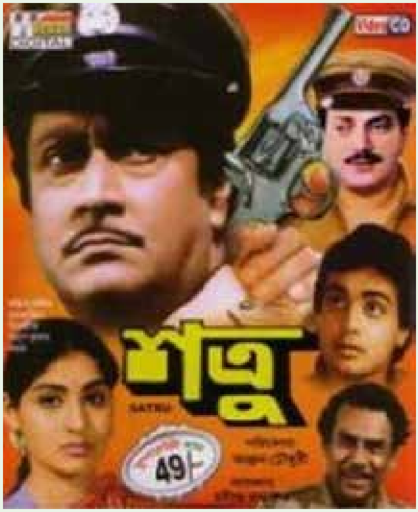

আশির দশক। মফসসলে তখনও হিন্দি সেভাবে জাঁকিয়ে বসেনি। এমনকী ভিডিও হল সংস্কৃতিও সেভাবে গড়ে ওঠেনি। সিনেমা বলতে শহরের সিনেমা হল। আর স্কুলে তিন চারদিনের পর্দা টাঙিয়ে ছবি দেখানো। সে অর্থে বলতে গেলে, আমার মনে প্রথম দাগ কাটা ছবি শত্রু। তখন কে অঞ্জন চৌধুরি, চিনতাম না। আমার কাছে শত্রু মানে রঞ্জিত মল্লিক। এক সৎ ও সাহসী পুলিশ অফিসার। সেই ছবিতে চিরঞ্জিৎ ছিলেন, প্রসেনজিৎও ছিলেন। কিন্তু আমার মনজুড়ে একজনই রঞ্জিত মল্লিক। সেই ছবিটা দেখেই পুলিশকে সম্মান করতে শিখেছিলাম। দৈনন্দিন নানা ঘটনায় পুলিশ সম্পর্কে ধারণা খারাপ হয়। তবু এখনও যে বিশ্বাসটা তলিয়ে যায়নি, তার একটা বড় কারণ শত্রু। মনে হয়, শুভঙ্কর সান্যালের মতো দারগা হয়ত এখনও আছেন।

তখন থেকেই রঞ্জিত মল্লিক আমার প্রিয় নায়ক। এই হ্যাংওভারটা তার পরেও আরও বছর পনেরো ছিল। রঞ্জিত মল্লিকের প্রায় সব ছবিই দেখেছি। মনে হত, এই লোকটা খারাপ হতে পারে না। একজন আদর্শবান লোক বললেই এই মুখটা ভেসে উঠত।

মনে রাখার মতো সব সংলাপ। হাততালি দিতাম। তখন মনে হত, এগুলো রঞ্জিত মল্লিকই বলছেন। পরে বুঝলাম, ওই সংলাপগুলো অঞ্জন চৌধুরির লেখা। ওই ছবিতে প্রসেনজিৎ ছিল গুন্ডা টাইপের। তাই পরে প্রসেনজিতের যত ভাল ছবিই দেখি, ওই ছবি একটা অন্যরকম ধারনা গড়ে দিয়েছিল। মনে হত, এই লোকটা খুব খারাপ। ছবিতে চিরঞ্জিৎও ছিলেন সৎ পুলিশের ভূমিকায়। হয়ত তাই তাঁর প্রতিও একটা আলাদা দুর্বলতা রয়ে গেছে।

মহুয়া রায়চৌধুরি। আশির দশকে আমার আরেক প্রিয় চরিত্র। কী মিষ্টি মুখটা! খুব কাছের মনে হত। হঠাৎ শুনলাম, আগুনে পুড়ে তাঁর নাকি মৃত্যু হয়েছে। সেটা কি চলে যাওয়ার বয়স ছিল! আশির দশকে মন ভারাক্রান্ত করার মতোই একটা ঘটনা। ছবির কথায় ফিরি। মন কেমন করে দেওয়া একটা গান ছিল— বল না গো, কার মা তুমি/ কোথায় তোমার ছেলে। গানটা পরে অনেকবার শুনেছি। যতবার শুনেছি, চোখ ছলছল করে উঠেছে। ছোট্টু নামে একটা ছেলের লিপে গানটা ছিল। আমি জানতাম, এটা ছোট্টুরই গান। বলতাম, ছেলেটা কী ভাল গান গায়! পরে জানলাম, ওটা নাকি আরতি মুখার্জির গান। ছেলের গলায় মেয়ের গান! এমন কত বিস্ময় যে তৈরি হয়েছে। হ্যাঁ, সেই ছোট্টু। আসল নাম মাস্টার তাপু। আরও দু একটা ছবিতে টুকটাক কাজ করেছে। তারপর ছেলেটা কোথায় যে হারিয়ে গেল! কেউ কি সন্ধান দিতে পারেন!

(বেঙ্গল টাইমসের জনপ্রিয় বিভাগ— ফিরে দেখা। ফেলে আসা সময়ের নানা ঘটনা, নানা অনুভূতি ও চরিত্র উঠে আসতে পারে এই ফিচারে। এবার উঠে এল আশির দশকের একটি জনপ্রিয় সিনেমা ও তাকে ঘিরে তখনকার ভাবনার কথা। এমন নানা বিষয় নিয়ে আপনিও লিখতে পারেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা: bengaltimes.in@gmail.com)

ফিরে দেখা

আশির দশক

টিভিতে দেখা, স্বপ্নে দেখা সেই রাজকন্যা

ময়ূখ নস্কর

সরোবরের জলে সাঁতার কাটছে একটি রাজহংসী। হঠাৎ সে গলা বাঁকিয়ে দিকবদল করল। শব্দ হল না। ঢেউ উঠল না। একটা পালকও বাঁকল না। শুধু জলের ওপরে কয়েকটা রেখা আঁকা হয়ে গেল। দেখেছেন এমন দৃশ্য? দেখে কী মনে হয়েছে? সরস্বতী ঠাকুরের কথা? দূর মশাই, তাহলে আপনি আশির দশকে কৈশোর কাটাননি।

এখন আপনার বয়স কত? চল্লিশ পেরিয়েছে? আকাশে লঘুভার সাদা মেঘ দেখে আপনার কী মনে হয়? কী মনে হয় এলোমেলো হাওয়ায় কাশফুলের ওড়াউড়ি দেখে? শরৎকাল, দুর্গাপুজো? দূর, তাহলে আপনি স্টেফি গ্রাফ বলে কাউকে দেখেননি। দেখেননি তাঁর সাদা স্কার্টের ছন্দময় ওড়াউড়ি।

আটের দশক। ঘরে ঘরে ঢুকে পড়ছে টিভি। সাদা কালো, তবু তার দৌলতেই বাইরের পৃথিবী উকিঝুঁকি মারছে বাঙালির ঘরে। পা রাখছে টেনিস নামক এক ভিনদেশি খেলা। বিটকেল তার নিয়ম কানুন। পনেরোর পরে তিরিশ, তারপরেই চল্লিশ। ডিউজ, অ্যাডভান্টেজ, ডাবল ফল্ট, আনফোর্সড এরর– বোঝা যায় না, কিছুই বোঝা যায় না।

তবুও এই না বোঝার মধ্যেই জার্মানি থেকে উঠে এল দুটি ছেলে-মেয়ে। একজন ফুটবলের গোলকিপারের মতো ড্রাইভ দেয়–সদ্য কৈশোর ছাড়ানো বরিস বেকার। আরেকজন স্টেফি গ্রাফ। তাঁর টিকালো নাক, তাঁর পনিটেল, সে জিতলেও কাঁদে, হারলেও কাঁদে। সেই প্রথম জানলাম, আনন্দেও কাঁদা যায়।

জার্মানি বললাম বটে। কিন্তু আসলে পশ্চিম জার্মানি। পৃথিবীর মানচিত্র তখন অন্যরকম

ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন তখনও মধ্যাহ্ন সূর্যের তেজে জ্বলছে। জার্মানির পূর্বে সমাজতন্ত্র, পশ্চিমে ধনতন্ত্র। মাঝে বিশাল এক পাঁচিল। ভারতীয়রা মনেপ্রাণে জানে, সোভিয়েত আমাদের বন্ধু। বাংলা তখন লালে লাল।

কিন্তু কী বিস্ময়, কী বিস্ময়। ধনতন্ত্রী পশ্চিম জার্মানির এক মেয়ের জন্য আকুল হল আমার সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে থাকা মন। চেকোস্লাভাকিয়ার মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা, যুগোস্লাভিয়ার মনিকা সেলেস–কমিউনিস্ট দেশ থেকে উঠে আসা দুই মেয়ের বদলে সমর্থন করলাম হিটলারের দেশের মেয়েকে। প্রেম আর কবে তত্ত্বকথা মানে!

হ্যাঁ, প্রেম। কৈশোরের প্রেম। ইংরেজিতে যাঁরে বলে ইনফ্যাচুয়েশন। কে শ্রীদেবী, কে মাধুরী, কে জুহি চাওলা! আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে ব্ল্যাক ফরেস্ট আর রাইন নদীর পারে। বন্ধুরা সিনেমা দেখে, সলমন–ভাগ্যশ্রী, কবুতর যা যা যা। আমি উইম্বল্ডন দেখি। দেখি সবুজ ঘাসে এক সফেদ কবুতরি উড়ে বেড়াচ্ছে, ছুটে বেড়াচ্ছে। নিখুঁত ফার্স্ট সার্ভে উড়ে যাচ্ছে তাঁর পনিটেল। যেন স্বর্ণালী শস্যগুচ্ছ। ফোরহ্যান্ডের মসৃণ পেলবতায় জার্মানি তরুণীর স্কার্ট যেন ইরানি কিশোরীর ঘাঘরা–ঘূর্ণি হাওয়ায় দোলে।

আশির দশক পেরিয়ে নব্বই এল। সোভিয়েত ইতিহাস হয়ে গেল। এক হয়ে গেল দুই জার্মানি। আর আমার ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়ল। মানে, স্কুল ব্যাগ থেকে একগাদা স্পোর্টসস্টার বেরিয়ে পড়ল। তার সবগুলোতেই ছিল স্টেফি গ্রাফের ছবি। একটা বই চুরি গিয়েছিল। কে চুরি করেছিল, জানতে পারিনি। স্কুলের বন্ধু বাপ্পাদিত্য খুব সাহায্য করেছিল। টিফিন টাইমে সবাই যখন মাঠে, আমি আর বাপ্পাদিত্য সবার ব্যাগ খুলে খুলে সার্চ করেছিলাম। চোরাই মাল পাওয়া যায়নি।

নতুন শতাব্দী এল। বিশ্বাসঘাতিনী স্টেফি বিয়ে করল আগাসিকে। এবং লজ্জা– ঘেন্নার মাথা খেয়ে বাচ্চা–কাচ্চার জন্মও দিল। আমিও মনের ব্যথা মনে চেপে খাঁটি বাঙালি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে উদ্যোগী হলাম।

এরপরেও কয়েক বছর কাটল। স্কুলের রি–ইউনিয়নে আবার দেখা হল বাপ্পাদিত্যর সঙ্গে। কথায় কথায় উঠল আমার স্টেফি প্রেমের কথা। উঠল আমার সেই বই চুরির কথা। বাপ্পাদিত্য হাসতে হাসতে বলল, বইটা আসলে সে–ই চুরি করেছিল। সবার ব্যাগ সার্চ করা হলেও তার ব্যাগটাই আমি সার্চ করিনি।

হৃদয় কী বিচিত্র। বাপ্পাদিত্যর হাসিতে আমিও হো হো করে যোগ দিলাম। অথচ, আটের দশকে হলে তার সঙ্গে আমার হাতাহাতি অবশ্যম্ভাবী ছিল।

স্মৃতিটুকু থাক

আরণ্যকের সেই দোবরু পান্না

একবার হোলির সময় আমরা কয়েক-জন বন্ধু দল বেঁধে বেড়াতে গিয়েছিলাম গালুডি। ঘাটশিলা পেরিয়ে সেই গালুডি খুব সুন্দর জায়গা। কুলকুল করে বয়ে চলেছে সুবর্ণরেখা। নদীর পাড়েই মহুয়া খাচ্ছিল একদল আদিবাসী। আমাদেরও ইচ্ছে হল, একটু মহুয়া খাই।

একজন আদিবাসী কাকাকে বললাম, আমাদের একটু মহুয়া দেবে! সেই কাকা বলল, আপনারা খাবেন? আমি বললাম, কেন খাব না? কাকা বলল, আমার সঙ্গে আসুন। বলেই হনহন করে হাঁটতে শুরু করল। প্রায় দু কিলোমিটা-রের মতো পথ। সে বকবক করে গেল। মহুয়ার ঘোরে বলে যাচ্ছিল, হালকা চালের কথা, কিন্তু অধিকাংশ কথার মধ্যে এক গভীরতা লুকিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, যেন এক দার্শনিকের সঙ্গে হাঁটছি। মনে মনে নামকরণ করে ফেললাম, দোবরু পান্না। হ্যাঁ, আরণ্যকের সেই দোবরু পান্না।

নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমাদের মহুয়া খাওয়াল। একটা বোতলে করে মহুয়া ভরেও দিল। টাকা দিতে গেলাম। কিছুতেই নিল না। বলল, আপনারা মহুয়া খেতে চেয়েছেন, এ তো আমার সৌভাগ্য, এর জন্য টাকা নেব কেন! সেই কাকার আসল নাম আর মনে নেই। কিন্তু হোলি এলেই আমাদের সেই দোবরু পান্নার কথা খুব মনে পড়ে।

দেবাশিস মণ্ডল, গড়িয়া

বেড়াতে গিয়ে বা অন্য কোথাও আপনি কি এমন কোনও মানুষের সন্ধান পেয়েছেন? লিখে পাঠাতে পারেন তাঁর কথা। লেখা পাঠানোর ঠিকানা

bengaltimes.in@gmail.com

১৬ বছরে লিখেছিলেন দাদার কীর্তি!

রুদ্র ভৌমিক

তাঁর কাহিনী নিয়ে একের পর এক ছবি তৈরি হয়েছে। মুম্বইয়ে নিজেও লিখেছেন একের পর এক চিত্রনাট্য। সেগুলো থেকে সেই সময়ের হিট হিন্দি ছবি তৈরি হয়েছে। কিন্তু নিজের ১৬ বছর বয়সে লেখা গল্প নিয়ে ছবি হতে পারে, কখনই ভাবেননি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

তখনও ব্যোমকেশের ভাবনা মাথাতেই আসেনি। আর ঐতিহাসিক উপন্যাস! সেগুলোও জন্ম নেয়নি। কলেজ জীবন থেকেই টুকটাক লেখালেখি। ওই ষোল বছর বয়সেই লিখেছিলেন প্রেমের প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু তখন বয়স অল্প। তাই সেই সময় প্রেমের গল্পটি কোথাও ছাপতে দেননি। পাছে বয়স্করা দেখে ফেলে!

পরে একের পর এক গল্প, উপন্যাস লেখা শুরু করলেন। সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। বম্বেতে চিত্রনাট্যকার হিসেবেও বেশ খ্যাতি। কিন্তু ষোল বছর বয়সের ওই গল্পটা কোথাও কখনও ছাপতে দেননি। মনে হয়েছিল, ওটা নেহাতই কাঁচা হাতের লেখা। যে লোকটা ব্যোমকেশ লেখে, সেই লোকটার নামে এই লেখা মানাবে না। এভাবেই লেখাটা পড়ে রইল ড্রয়ারের মধ্যেই।

সামনে এল তাঁর মৃত্যুর পর। ১৯৭০ সালে পুনেতে থাকাকালীন হল সেরিব্রাল অ্যাটাক। আনা হল বম্বেতে। সেখানেই মৃত্যু। মৃত্যুর পর এই অপ্রকাশিত গল্পটি প্রকাশ পেল। যেটি সারাজীবন কাঁচা হাতের লেখা বলে কোথাও ছাপতে দিলেন না, সেটি প্রকাশ হতেই অন্য মোড় নিল। এগিয়ে এলেন তরুণ মজুমদার। ঠিক করলেন, এই গল্পটা নিয়েই সিনেমা বানাবেন। বললেন, এই গল্পের চিত্রসত্ব চাই। একটু একটু দাঁড় করালেন গল্পটাকে। তৈরি হল চিত্রনাট্য। গল্পের নামটা বদলে গেল। সেই ছবিই হয়ে উঠল ‘দাদার কীর্তি’।

ভ্রমণ

পলাতক হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা

শান্তনু দেশাই

ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে ঝমঝম করে একটা ব্রিজ পেরোলো ট্রেনটা। নদীর নাম দেখলাম ডায়না। ভারী সুন্দর তার গড়ন। জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁ গো তুমি বিদেশি নাকি? কলকলিয়ে হেসে বললো কেন গো? নদীর আবার দেশ বিদেশ হয় নাকি?

আমাদের তো সারা বিশ্ব এক দেশ। সকলেই আমরা কারো না কারোর সঙ্গে জড়িয়ে আছি। তোমরা নিজেদের মত করে ভাগ করে নিয়েছ।

লজ্জায় পড়ে গেলাম। সত্যি তো আমরাই বিশ্বকে বিভাজিত করেছি।

ট্রেনটা দাঁড়িয়ে গেল কিছুক্ষণ। ভালোই হোল। আমি ডায়নার সাথে বেশ কিছুক্ষণ গল্প করার সুযোগ পেলাম। ডায়না, তিস্তা, তোর্ষার খোঁজ নিল। আমাকে সুধালো কোথায় যাচ্ছি।

বললাম কোথাও নয় গো। এমনি অলস ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ডায়না বললো, ও, পলাতক ছবির রেশ নাকি !

নাঃ, সে আর পারি কই।

ট্রেন হুইসেল বাজিয়ে দুলে উঠল। ডায়না কে বিদায় জানিয়ে এগিয়ে চললাম। জানালার বাইরে সরে সরে যাচ্ছে দৃশ্যপট। আমার কল্প জগৎ সারাক্ষণ অনুরিত হচ্ছে সেই চলমান দৃশ্যের।

আমি একটু বেশিই কল্পনা প্রবণ।

কৈশোর বয়সেও সাহিত্য পরীক্ষায় বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ, নিয়মানুবর্তিতা, বা

কোনও মনীষীদের অবদান রচনা ছেড়ে আমি একদম শেষে থাকা একটি বট গাছের আত্মকথা বা একটি নদীর আত্মকথা লিখতে পছন্দ করতাম।
কলেজে নীরস লেকচারের ফাঁকে খোলা জানালা দিয়ে বাইরের ঘুরপাক খেয়ে ওঠা ধোঁয়ার কুন্ডলী দেখে বিভোর হয়ে যেতাম।
সেই কল্পনার কলতান ইদানিং একটু কমেছে সাংসারিক চাপের কারণে। মনের চাতালে শ্যাওলা জমেছে।
তবু আজও সুযোগ পেলেই মন উড়ি উড়ি।
ট্রেনের আরামপ্রদ চেয়ারে প্রায় সকলেই মুঠো ফোনে মগ্ন। জানি না কি দেখেন, শোনেন। ট্রেনের জানালার বাইরে তখন একটা ছোট্ট গ্রাম। অনেক সুপারি গাছ, দরমার বেড়া দেয়া গোয়ালঘর। টিনের চালা দেয়া দু কামরার ঘর থেকে ধোঁয়া উঠছে। হয়তো কেউ কাচি মাছের বাটি চচ্চড়ি বসিয়েছে। ঝাল ঝাল কুল লঙ্কা দিয়ে সে বড় লোভনীয়।
বেশ কদিন ধরেই এদিকে তুমুল বৃষ্টি হয়েছে। খাল বিল গুলো ভর ভর। তাতে কয়েকজন বাঁশের ঘনি দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টায়। আনারস ক্ষেতে জল ঢুকেছে। একটা মন্দির জেগে আছে। তার চাতালে দুইজন বসে।
ভাবি ওরা কি নিয়ে কথা বলছে।
ডবল ডোজ, বুস্টার, নিউ ভ্যারিয়েন্ট এইসব শব্দ কি ওদের জানা?
সেভক স্টেশন এ বিরাট কর্মযজ্ঞ চলছে।
আমাদের শহুরে স্বাচ্ছন্দের বলি কয়েক হাজার গাছ।
শুধুই কি গাছ? তাতে থাকা কত পতঙ্গ, পাখি ? ওরা কোথায় যাবে ?
কতদিন জোনাকি দেখিনা।
রাঙারুনে হোম স্টের বারান্দায় বসে দূরে আলোকমালায় সজ্জিত দার্জিলিং শহরকে দেখে জোনাকি দেখার স্বাদ মেটাই।
আমরা খুব হিংস্র।
ভাবনায় ছেদ পড়ে হকারের ঝালমুড়ির আওয়াজে। কি সুন্দর সাজানো।
কিন্তু আমি যে সব কিছু সাজানো পছন্দ করিনা। একটু অগোছালো থাকাও ভালো।
সাজানোর সুযোগ থাকবে তো।

এই দেখোনা সাজানো কাশ্মীর ভ্রমণ করতে
গিয়ে মনটা একদম অগোছালো হয়ে গেল।
হৈ হট্টগোল, দৌড়াদৌড়ি করে বেহাল।
অশান্ত মনকে শান্তি দিতে তিনদিনের ছুটিতে
চলে এলাম বর্ষার দার্জিলিংয়ে।
কোনও তাড়াহুড়ো নেই, কোলাহল নেই।
টিপটিপ বৃষ্টিতে ছাতা মাথায় অলসভাবে
লেবঙ কার্ট রোড, ভুটিয়া বস্তি, মহাকাল
মন্দির ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।
চাইনি তবু সে দেখা দিল।
গুনগুন করে গান শোনালাম... আমি আপন
করিয়া চাহিনি তোমারে, তুমি তো আপন
হয়েছো।
লাজুক হেসে মেঘের চাদরে ঘোমটা দিল।
এই বেশ।
রোহিনীর রাস্তা ধরে শেয়ার জিপে যখন
আসছিলাম তখনই চোখে সবুজের আস্ত-
রণ ঘন হয়ে লেপ্টে গিয়েছিল।
জোড় বাংলো নেমে উল্টোদিকের রাস্তা
ধরে তিন মাইল এসে যখন রাঙ্গারুন
এর রাস্তা ধরলাম সে সবুজ আপ্লুত করে
দিল।
কোথাও ঈষৎ হলুদাভ, কোথাও গাড়
সবুজের শেড। জনমনিষ্যির চিহ্ন মাত্র
নেই সারা রাস্তা জুড়ে।
ট্রেকার্স হাট, খালিঙ্গ হোম স্টে পেরিয়ে
আশ্রয় নিলাম নিলম হোম স্টে তে।
ছোট্ট ছিমছাম ঘর বারান্দা। রাঙারুন এর
চা বাগান এই অঞ্চলের সবথেকে প্রাচীন।
দুঃখের বিষয় চা কারখানা টি বন্ধ। পূর্বের
শ্রমিকরা কেউ দূরের বাগানে কাজ
নিয়েছে, কেউ ঘরের সামনে দোকান
করে দিন গুজরান করে।
পায়ে হেঁটে ঘুরতে বেশ লাগছিল।
কিছুটা দূরেই লাকপা হোম স্টে। সবথেকে
সেরা লোকেশন। ঘর থেকেই চা বাগান
সহ টাইগার হিল, দার্জিলিং শহর দৃশ্যমান।
গাঁয়ের নীচে নদী। অন্য সময় জল থাকেনা।
নদী পেরিয়ে পাহাড় চড়ে টি এন রোড ধরে
দার্জিলিং যাওয়া যায়।
আমার সে আশায় জল ঢেলে দিল নদী। জল
বিপদজনক ভাবে বয়ে চলেছে। পারাপার
মুশকিল।
পরদিন রাঙারুন কে বিদায় জানিয়ে চলে
এসেছিলাম দার্জিলিং।
আস্তাবল পেরিয়ে ম্যাল থেকে একশ মিটার
দূরে সস্তার হোটেলে এক রাত কাটিয়ে
নেমে গিয়েছিলাম শিলিগুড়ি।
ভবঘুরের মত ইচ্ছে নিয়ে কোনও
গন্তব্য রাখলাম না। সকালের ট্রেন ধরে
ডুয়ার্সের ঘন সবুজ গায়ে মেখে, চোখে
লেপটে পৌছেছিলাম আলিপুরদুয়ার।
খানিক বিশ্রাম আর দুপুরের ভোজন
সেরে ফিরতি পথে ডুয়ার্স রানী কাঞ্চন
কন্যা ধরে বাড়ির পথে পা বাড়ানো।
রাজাভাতখাওয়া স্টেশন এর পাশে নুড়ি
পাথরের খাঁজে অনেক অনেক প্রজাপতি
উড়ছে, বসছে ঘুরছে। কিতাবি ভাষায়
মাড পুডলিং বলে।
ওরা ডাক দিল, আসবে না?
বললাম, আসবো আর একদিন,
আজ যাই।

বেঙ্গল টাইমস

১ ডিসেম্বর, ২০২৫

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in